আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

বর্ষাকালীন সংখ্যা

আষাঢ় ১৪২৯

শতবর্ষে পা রাখেলন তিনি। মৃণাল সেন। বাংলা তথা ভারতীয় ফিল্মের বিখ্যাত ট্রায়োর অন্যতম এই ব্যক্তিত্বের লেন্সে তাঁর সমসময় তথা সমকালের রাজনীতি ধরা পড়েছিল ভিন্ন আবহে। মৃনালের ছবিগুলির প্রেক্ষিতে এই সময় বিধৃত রয়েছে তার নিজস্ব আবহে। শতবর্ষীয়ান মানুষটিকে নানা কোন থেকে দেখা ---- এই সংখ্যায় স্রেফ এইটুকুই চাইল বাংলা স্ট্রিট।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

বিচিত্র একটা উপদ্রুত সময়পর্বের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। স্বাধীনতা-উত্তর ভারত বুঝি লাগাতার এত উপদ্রব, এত আঘাতের মুখোমুখি হয়নি আগে কখনো।

অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি সর্বত্রই অদ্ভুত একটি কাহিল অবস্থা। তার মধ্যেই পারস্পরিক অদ্ভুত একটা ঘৃণার আবহকে উস্কে দিয়ে যারা ফয়দা লুটতে চাইছে দাতে নখে লড়াই চলছে এখন তাদের সঙ্গেই। ভাবলেও অবাক লাগে এত ঘৃণার উৎসমুখ লুকিয়ে ছিল আমাদেরই মধ্যে। ঘরে-বাইরে এই লড়াইতে শেষ পর্যন্ত শুভ বুদ্ধির জয় যে হবেই তা নিশ্চিত, কিন্তু তার আগে এখন প্রতি মুহূর্ত সজাগ থাকার পালা। এই মুহূর্তে সবার সঙ্গে পাঠকদের শুভেচ্ছা পাথেয় করে কাঁধে কাঁধ সজাগ বাংলা স্ট্রিট আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই অমানিশা অচিরেই কেটে যাবে এই কামনা নিয়ে এবারের মতো ইতি টানা যাক।

এ বছর শতবর্ষে পা রাখলেন মৃণাল সেন। বাংলা তথা ভারতীয় ছায়াছবির পথপ্রদর্শক-ত্রয়ীর অন্যতম এই ব্যক্তিত্বকে ঘিরে এবারের এই একগুচ্ছ রচনায় বিধৃত রইল এই অসামান্য প্রতিভার প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

সূচিপত্র

কোয়াড কি কোনো কাজের ? Page 4
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

হারিয়ে যাচ্ছে কলকাতার সেই বিখ্যাত 'আর্মানিটোলা ? Page 9
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

মৃণাল সেন : প্রাইভেট মার্কসিস্ট Page 14
চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

মৃণালদা ছিলেন আমার কাছে শিক্ষকের মতো Page 22
রাজা সেন

মৃণাল সেন সম্পর্কে দুয়েকটি কথা, যা আমি জানি Page 27
পুণ্যব্রত পত্রী

মৃণাল সেন এবং আমাদের চেনা-অচেনা কলকাতা Page 31
অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালির আত্মমর্যাদা ও সাফল্যের প্রতীক পদ্মা সেতু Page 35
তরুণ চক্রবর্তী

বিপন্নতা বাড়ছে মধ্যবিত্তের Page 39
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

কস্তুরী --- এক অনন্য স্বাদের আকর্ষণ Page 43
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

এবং মহামেডান Page 47
প্রসেনজিৎ মজুমদার

লেখা ১

কোয়াড কি কোনো কাজের ?

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

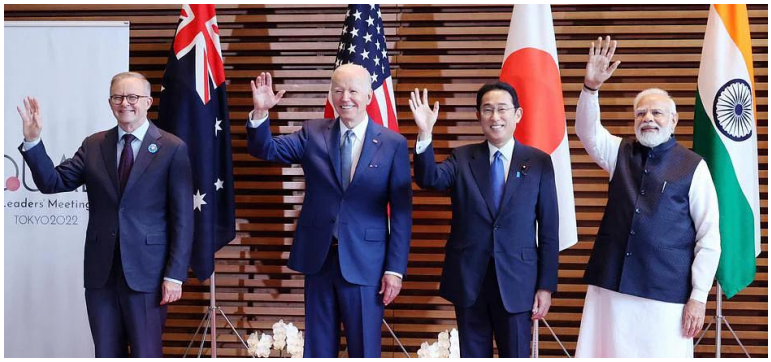

কোয়াড সামিট সম্প্রতি শেষ হল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের আশ-পাশের দেশগুলোর ওপর চীনের ধমকি শুরু। গত বছরও কোয়াড সামিটের পর ঢাকায় চীনের রাষ্ট্রদূত এমনই কাণ্ড করেছিলেন, এবং তার প্রায়শ্চিত্তও তাঁকে করতে হয়েছিল। চীন এবার ঢাকাকে বলেছে যে শুধু কোয়াড জয়েন করাই নয়, কোনো রকম বাণিজ্যিক ব্লকের সঙ্গে থাকাটা (যা এশিয়ার নয়) বাংলাদেশের পক্ষে সুবিধাজনক হবে না। চীনের গায়ে কোথায় ফোস্কা পড়ছে সেটা অবশ্য বোঝা যায়। আর সি ই পি, যেটা প্রধানত চীনের মস্তিষ্ক প্রসূত – খুব ভালো চলছে না। চীন নানা রকম প্রলোভন দেখিয়েও ভারতকে তাতে ঢোকাতে পারেনি, কেননা সেটা ভারতের এবং প্রধানত ভারতের চাষিদের পক্ষে ক্ষতিকারক হত।

তাহলে এখন এমন কী হল যেটা চিনের পক্ষে 'রেড ফ্ল্যাগ' ? এবারকার সামিটের পরে জয়েন্ট স্টেটমেন্টে যেসব কথা বলা হয়েছে, তাতে চীনের চিন্তিত হবারই কথা। প্রথমত পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি, যা খরচ হবে আগামী পাঁচ বছরে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ওপর। দ্বিতীয়ত, তেইশটা দেশ নিয়ে 'ইন্ডো-প্যাসিফিক ইকনমিক ফোরাম' তৈরি করা। তৃতীয়, ইন্ডো-প্যাসিফিক মেরিটিম সিকিউরিটি জোরদার করার ডাক, চতুর্থ, ইউক্রেন সম্বন্ধে জয়েন্ট স্টেটমেন্টে কিছু না বলা (যা বলা হয়েছে সেটা না বলারই মতো, শুধু চীনকে একটু খোঁচা দিয়ে রাখা –ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে আমাদের একটু সাবধান হওয়া উচিত, যাতে এখানে সেরকম কিছু না হয় – পক্ষান্তরে চীনকে তাইওয়ানের বিরুদ্ধে কোনো রকম কিছু করার থেকে

বিরত থাকতে বলা হল), এবং পঞ্চম, আতংকবাদের বিরুদ্ধে একটা কড়া মন্তব্য (এর মধ্যে এফ এ টি এফ সম্বন্ধেও বলা আছে, যা পাকিস্তানের একেবারেই পছন্দ হবে না)।

ভারতের পক্ষে চতুর্থ এবং পঞ্চম, এই দুটো পয়েন্টকে কূটনৈতিক জিত বলা যেতে পারে। যেখানে কোয়াডের বাকি তিন সদস্য প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে রাশিয়ার সমালোচনা করছে, সেখানে পুরো ব্যাপারটা সম্মিলিত বয়ানের থেকে বার করে দেওয়া, এটা একটা জিত তো বটেই – যেখানে একা আমেরিকাই বলেছিল যে ভারতের ইউক্রেনের ব্যাপারে অবস্থান 'শেকি' । সামিটের পরে জাপান এবং আমেরিকা ইউক্রেন সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছে, কিন্তু জয়েন্ট স্টেটমেন্টে তার কোনো উল্লেখ নেই।

আতংকবাদের ওপর কোয়াড যে কথা বলেছে তাতে পাকিস্তান এবং চীন, দুজনকেই ধরা যায়। মনে রাখতে হবে যে সাংহাই কোঅপারেশনের মিটিং-এও একই কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে এই দুটো দেশ প্রধান ছিল, এবং ভারত জোর গলায় অনেক কিছু বললেও, শেষমেশ যা বেরিয়েছিল তা নিতান্তই জোলো। সেদিক থেকে কোয়াডের স্টেটমেন্ট অনেক কড়া।

ঠিক আছে, কিন্তু যে দুটো পয়েন্ট আলোচনা করলাম তাতে চীনের বিশেষ রাগ করার কিছু নেই। তাহলে রাগটা আসছে কোথা থেকে? পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে বিনিয়োগ কোনো অংকই নয়। ওইটুকু টাকাতে কিছুই হয় না। তাও আবার পাঁচ বছরে। চীন তার থেকে অনেক বেশি টাকা ব্রি-তে লাগিয়ে বসে আছে (ব্রি অর্থে BRI, Belt and Roads Initiative) – যদিও তার রিটার্ন খুবই কম। আফ্রিকার কোনো কোনো দেশ তো লোনের টাকা ফেরৎ দিতেই চাইছে না। পাকিস্তানে অনেক টাকাই জলে গেছে শুধু দুর্নীতির জন্য, এবং পাকিস্তানের পক্ষে টাকা ফেরৎ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। সব মিলিয়ে অবস্থা ভালো নয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৩০০ বিলিয়ন ইউরোর, তাদের নিজেদের কানেক্টিভিটি স্ট্র্যাটেজির জন্য। কিন্তু তার কিছুই এখনো খরচা হয়নি। সেদিক থেকে কোয়াডের অংক কিছুই নয় যদিও, কিন্তু এটা সহজেই খরচ করা যায়। এবং করতে পারলে সেটা যে ইন্ডো-প্যাসিফিকের অন্যান্য দেশগুলোর সামনে ব্রি-এর বিকল্প হয়ে উঠবে, সেবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। কোয়াড এই প্যাঁচটা ভালো খেলেছে। এছাড়া এই বিনিয়োগ করা হবে প্রত্যেকটা দেশের উপর ঋণের বোঝা না চাপিয়ে। যেহেতু চীন এতদিন ধরে উল্টোটাই করেছে – এবং তার ফলও ভুগছে – সেহেতু এটাও ইন্ডো-প্যাসিফিকের দেশগুলোর কাছে অনেক সহজগ্রাহ্য।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পয়েন্ট বুঝতে গেলে একটু ভূগোল দেখতে হবে। ইন্ডো-প্যাসিফিক বলতে ঠিক কী বোঝায় ? মুম্বাই থেকে করাচী হয়ে মাস্ক্যাটের তীর দিয়ে ইরান হয়ে এদেন, এবং তারপর জিবুতি ছুঁইয়ে সেশেলসের পাশ ঘেঁষে, মালদ্বীপ হয়ে কলম্বোতে হাজিরা লাগিয়ে মালাক্কার অলি-গলি দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার বুড়ি ছুঁইয়ে, জাপান এবং আরও ওপরের বিস্তীর্ণ এলাকা হল ইন্ডো-প্যাসিফিক (একটু ঘনাদার ভৌগোলিক বর্ণনার মতো হয়ে গেল, ক্ষমা করবেন)। ম্যাপ দেখলেই বোঝা যায় এলাকা কত বড়ো। পৃথিবীর বণিজ্যের একটা খুব বড়ো অংশ যায় এই রুট ধরে। এই রাস্তার ওপর কব্জা করার জন্য চীনের ‘মুক্তার হার’ – ‘স্ট্রিং অফ পার্লস্’ । এবং এর প্রত্যেকটা ‘চোক পয়েন্ট’ – অর্থাৎ যেখান থেকে এই রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে দেওয়া যায় – নিজের কব্জায় নিতে চীন বদ্ধ পরিকর। এখানে মনে রাখতে হবে চীনের বেআইনি মাছ ধরাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও এই প্রচেষ্টা। এই কাজ করতে চীন জিবুতি এবং অন্যত্র নিজের সামরিক ঘাঁটি বসিয়েছে, মালদ্বীপে ভারত-বিরুদ্ধ পার্টিকে মদত করেছে এবং করছে, শ্রীলংকাতে বন্দর এবং অন্য প্রকল্পে টাকা লাগিয়েছে, পাকিস্তানে গোয়াদার বন্দরে ইনভেস্ট করেছে, ইত্যাদি।

আপাতদৃষ্টিতে তাহলে চীন তো ভালো জায়গাতেই আছে। তাহলে ওদের চিন্তার কি কারণ ?

কারণ আছে। কেননা গল্পটা এখানেই শেষ নয়। মুক্তার হার ছাড়া আরও একটা হার এখন ইন্ডো-প্যাসিফিকের গলায় পরানো হচ্ছে – হীরের নেকলেস।। আর এর উদ্যোক্তা হল ভারত। ভারতের নজরও ‘চোক-পয়েন্টে’ । প্রথম চোক-পয়েন্ট মাস্ক্যাট, যেখানে ভারতের যথেষ্ট খাতির। দ্বিতীয় ইরানের চাবাহার বন্দর। এর সম্বন্ধে সবাই প্রায় জানেন (চীন চাবাহার নিয়ে যাচ্ছে – এগুলো ডিসিনফরমেশন, বিশ্বাস করবেন না),

তারপর এডেন হয়ে সেশেলস দ্বীপপুঞ্জে এসেনশন দ্বীপ, তারপর মালদ্বীপ, শ্রীলংকা আবার হীরের নেকলেসে ঢুকব ঢুকব করছে, মালাক্কা স্ট্রেট (কেননা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো, অন্তত চীনের থেকে ভালো)) তারপর সী অফ জাপান হয়ে মঙ্গোলিয়া হয়ে তুর্কিস্তান ইত্যাদি তারপর ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ করিডর। এই পুরো বেড়টাই মুক্তোর মালার ভিতরে। সুতরাং বাইরে থেকে চীন যদি কিছু করতে চায়, তার আগেই হীরের নেকলেসকে কাজে লাগানো যাবে। কূটনৈতিক চাল ভারতও খেলে চলেছে। গত কয়েক বছরের মালদ্বীপ, সেশেলস ইত্যাদির ইতিহাস দেখলেই বুঝতে পারবেন। সে আলোচনায় যাচ্ছি না।

মজাটা হল, এখন এই হীরের নেকলেসের পিছনে কোয়াডের তাকত, যেটা এতদিন ছিল না। এটা ভাবনার কারণ বইকি? লক্ষ্য করুন, যেসব দেশের অথা বলেছি তাদের কাছে ৫ বিলিয়ন ডলারও অনেক টাকা। আর সে টাকা নেওয়া যাবে নিজের দেশকে চীনের হাতে না বেচে। ঋণ না করে, আর ঋণ করলেও খুব সস্তায়। আর শুধু তাই তো নয়, এছাড়া রয়েছে সামরিক শক্তির প্রয়োগ। অর্থ এবং বাণিজ্যিক নীতির দিক থেকে দেখতে গেলে ইন্ডো-প্যাসিফিক ইকনমিক ফোরামের সদস্য হওয়া মানে নিজের সার্বভৌমত্ব নষ্ট না করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেমন ভাবে চলে, আগামী দিনে সেরকম কিছু করার মতো অবস্থায় আসা। চীন যদি বিগ-ব্রাদার হওয়া না বন্ধ করে, তাহলে এটা অঙ্কে প্রশস্ত পথ। আর চীন যে সহজে সেটা করবে না, সেটা বাংলাদেশের প্রতি চীনের আচরণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

আরো একবার সামরিক শক্তির কথা বললাম। একটু বিশদে বলি। কোয়াড সামিটের আগে এবং পরে দুটো ঘটনা আরো ঘটেছে। প্রথম আমেরিকার সঙ্গে ভারতের চুক্তি, যে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ ভারতের বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। এটা সামিটের

আগে। জাপান ভারতকে সামরিক অস্ত্র ইত্যাদি সাপ্লাই করতে রাজি এবং হাই-টেকনোলজি তাতে শামিল। এটা পরে। আর মিলিয়ে বলতে হবে কি?

শেষে একটা পয়েন্ট বলা জরুরি। হীরে আর মুক্তোর নেকলেস যদি ম্যাপে এঁকে দেখেন তাহলে দেখবেন যে হীরের নেকলেসের ঠিক মধ্যিখানে ভারত, আর মুক্তার নেকলেসের একপাশে চীন। অবস্থানগত প্রাধান্যটা ভারতের পক্ষেই যায়।

পরিশেষে দু একটা কথা আরো বলা দরকার। কোয়াডের পর সর্বত্র, বিশেষত ভারতে, এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এবং সামিটে যা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে প্রশংসার্হ। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, ছোটো দেশগুলি অনেক দিন থেকে অনেকের প্রতিশ্রুতি শুনে আসছে। কাজের কাজ প্রায় বিশেষ কিছুই হয়নি। এবারও যদি না হয় তাহলে ইন্ডো-প্যাসিফিক একেবারেই হাতছাড়া হয়ে যাবার সব্রকম সম্ভাবনাই রয়েছে। এবং এই ক্ষেত্রে ভারতকেই আগে এগিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, এর আগে ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের সঙ্গে বিগ-ব্রাদার আচরণ করে অনেক ভুগেছে। তখন যদি ব্যবহার ঠিক থাকত, অনেক প্রতিবেশী রাষ্ট্রই হয়ত চীনের দিকে ঝুঁকত না। সে এখন ইতিহাস। তবে এবার আর সে ভুল করলে চলবে না। প্রথম থেকেই সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে এবং সবাইকে সঙ্গে নিতে হবে। নইলে হীরের নেকলেসের ভবিষ্যত অন্ধকার।

লেখা ২

হারিয়ে যাচ্ছে কলকাতার সেই বিখ্যাত ‘আর্মানিটোলা’ ?

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসার আগেই এদেশে এসেছিলেন আর্মেনিয়ানরা। তাঁদের হাতেই তৈরি হয়েছিল কলকাতায় সর্বপ্রথম ইউরোপিয়ান কলোনি। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিমভাগে তাঁদের ভারতে আগমন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও বিস্তারিত ইতিহাস রেখে সেই কবেই অতীত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আর্মেনিয়ানরা আজও রয়ে গিয়েছেন এই কলকাতায়। ‘সহজপাঠ’ দ্বিতীয়ভাগে তাই হয়তো সহজভাবেই ‘আর্মানিগির্জে’ -র র কথা উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আজকের কলকাতায় আর্মেনিয়ানদের সমান্তরাল জীবনযাত্রা কেমন করে বয়ে চলেছে এটা কিন্তু ‘সহজপাঠ’ -এর মতো সহজবোধ্য নয়। কলকাতায় বরাবরই আর্মেনিয়ানদের জীবনযাত্রা যেন একটি সমান্তরাল ধারায় বয়ে এসেছে। বয়ে চলেছে আজও। কিন্তু কী ভাবে ?

এইটা খুঁজে বার করার আগ্রহ থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে শেষমেশ যেখানে গিয়ে পড়তে হল, তাকে নিঃসন্দেহে বলা যায় এক ‘ভুলভুলাইয়া’ । আর সেই ‘ভুলভুলাইয়ার’ অভিজ্ঞতা কিছুটা ভাগ করে নিতেই এই লেখা।

আর্মেনিয়ানদের জীবনচর্যায়, তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে ‘চার্চ’ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই গীর্জা দিয়েই শুরু করি। দেখা গেল, এইগীর্জার ঠিকানা যত সহজেই লোকে বলে দিতে পারে, খুঁজে বার করা ততটাই কঠিন। ডালহৌসি স্কোয়্যারের পিছন দিকে গঙ্গার অভিমুখ ধরে এগোলে বড়বাজারের মধ্যস্থলে যে এমন এক রহস্য লুকিয়ে তার খবর কলকাতার কোনো গাইড দিতে পারবেন কিনা জানা নেই।তবে একান্ত অবসরে একলা

ঘুরে দেখার চেষ্টা করতেই পারেন কেউ। হ্যাঁ,এখানেই অবস্থিত কলকাতার প্রাচীনতম আর্মেনিয়ান চার্চ, রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত সেই 'আর্মানিগির্জে' ।

ভুলভুলাইয়ার প্রথম নিদর্শন। মেইন রাস্তায় দুই পাড়ে দুটি গির্জা পাওয়া যায়, বাম পাশে সিনাগগ, ডানপাশে কোণাকোণি ক্যাথলিক চার্চ। অথচ তাদেরই মধ্যমণি হয়ে যে সর্বপ্রাচীন আর্মেনিয়ান গির্জা স্বমহিমায় বিরাজ করছে, বাইরে থেকে তা আন্দাজ করতে ফেলুদাও ফেল মেরে যেতেই পারেন। ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়ার উপায় নেই। এই গীর্জার চূড়ো বাইরে থেকে সহজে দেখা যায় না ! আশ্চর্য ! এটা কি কোনো জ্যামিতিক খেলা ? নাকি দোকানপাট-মুটে-মজুর-ভ্যান চলাচলের বত্রিশ ভাজা ভিড়ের ঠেলায় সাময়িক দৃষ্টিবিভ্রম ! মনে সে প্রশ্ন আসবেই। নন্দরাম মার্কেটের ঠিক উল্টোদিকে ব্র্যাবোর্ণ রোডের যে অংশটি সিনাগগ স্ট্রিট নামে পরিচিত ছিল, তাকেই মাঝ বরাবর কেটেছে ঘেঁষাঘেঁষি বিপণিতে ঠাসা সংকীর্ণ গলি –আর্মেনিয়ান স্ট্রিট। ইমিটেশন গয়না, রঙ, বাসনপত্রের চকমকি পেরিয়ে একবার গলিটিতে ঢুকে পড়লে আরও চিত্তির। দোকানদার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেও আপনার পক্ষে গীর্জাটিকে চিহ্নিত করা মুশকিল হবে। অথচ সেই মূহুর্তেই আপনি হয়তো গীর্জার সাদা দেয়ালের গায়েই দাঁড়িয়ে। অভ্যস্ত চোখখুঁজছে একটা চূড়ো, যার শীর্ষে ক্রস লাগানো। সহজে দেখা মিলবে না। গীর্জার দেয়াল ধরে একটা হাফ সার্কেল চক্কর দিলে একটি বিশেষ পয়েন্ট থেকে আচমকাই দৃশ্যমান হয়ে উঠবে প্রাচীন গীর্জার চুড়ো, ঘড়িঘর। গীর্জার বিস্তীর্ণ দেয়ালটিকে বেষ্টন করে রয়েছে পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট। সাদা দেয়ালের চিড় খাওয়া দাগ ফিসফিস করে বলে উঠবে ১৭ শতকের ইতিহাস। সেই ১৭০৭ সাল থেকে এই গীর্জার দাঁড়িয়ে থাকার সাক্ষ্য দিচ্ছে কারুকাজ করা কালো কাঠের বিশাল ফটকের বাইরে লাগানো মার্বেল ফলক : 'দ্য হোলি চার্চ অফ নাজারেথ।' বিশেষ অনুমতি ছাড়া সাধারণের ভেতরে প্রবেশ এখন প্রায় নিষিদ্ধ। নিষেধের কারণ খানিক অস্বচ্ছ।সেটি

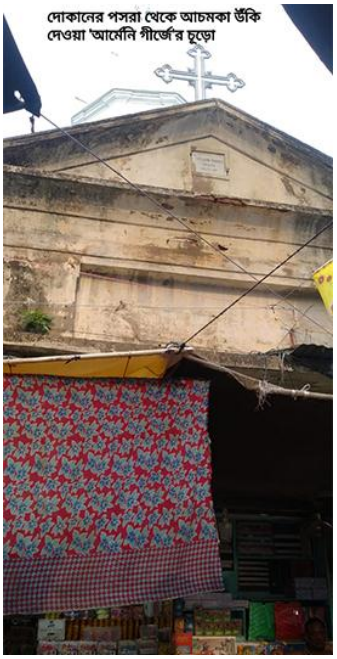

জানার চেষ্টা করলে ভর দুপুরে জনৈক স্টেশনারি দোকানদার এই বলে ভড়কে দিলে বিচিত্র নয়– ‘সাহেব মেমসাহেবদের আত্মা ঘুমোচ্ছে ওখানে। ভেতরে গিয়ে করবেনটা কী?’

হ্যাঁ, সূত্র বলছে এটি প্রথমে সমাধিস্থল হিসেবেই ব্যবহার হত। পরে ব্রিটিশরা একটি পুরোনো কাঠের গীর্জা তৈরি করে দিলেও ১৭০৭সালে সেটি অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায়। এরপর জ্যাকব নাজার নামের এক আর্মেনিয়ান এই চার্চটি তৈরি করতে উদ্যোগ নেন। ব্যবসা করতে এসে কলকাতার ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে আর্মেনিয়ানরা জমিয়ে বসেছিলেন। ব্রিটিশদেরও আগে গঠিত হয়েছিল আর্মেনিয়ানদের কলোনি, যা সেদিন ‘আর্মেনিপাড়া’ বলে সুপরিচিত ছিল। এখন গেলে অবশ্যই তার চিহ্নটুকু অব্দি মিলবে না স্বভাবতই। পাড়া তো সেই কবেই উধাও।ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে বড় নিদর্শন বলতে রয়েছে শুধু আর্মেনিয়ান কলেজ ওস্কুল। কলেজ কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা যাচ্ছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল মাত্র আর্মেনিয়ানরাই পড়াশোনা করেন। চলতি সময়ে প্রায় ১০০ছাত্র এখানে আইসিএসসি বোর্ডের অধীনে পাঠরত। কলেজেরই হোস্টেলে তারা থাকেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে চলে যান আর্মেনিয়ায়, যে যার বাড়িতে। আবারো ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁরা বারে বারে ফিরে আসেন কেন কলকাতায় ? তাঁদের পূর্বসূরীদের কারণেই কি এই শহরের প্রতি একাত্মতা? প্রশ্নটা থেকে যায় যেমন , উত্তরটাও তেমনই আলোছায়ায় লুকোচুরি খেলে যায় । কারণ একসময়ের পরিচিত আর্মেনিয়ান রেস্টুরেন্ট আজ কলকাতা থেকে উধাও। জানতে চাইলে লোকজন হাঁ করে তাকায় !

আছে আরো কয়েকটি নিদর্শনের দৃষ্টান্ত যা রীতিমতো ধন্দে ফেলে দিতে পারে। সূত্র বলছে ২১ নম্বর পার্ক স্ট্রিট, এই ঠিকানায় নাকি ছিল একটি আর্মেনিয়ান ক্লাব। এখন যান। দেখা যাবে আর্মেনিয়ান ক্লাব সমেত গোটা ঠিকানাটাই ২২নম্বর, ১৯নম্বর ও ২৭ নম্বরের মিশেলে উধাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কীভাবে ? সেটা ভারি আশ্চর্যের।

পার্ক হোটেলের একটু আগে ওই ফুটপাতেইএকটি বড়ো গেট রয়েছে। সিকিউরিটি গার্ডের বর্ণনা অনুযায়ী, এই গেটের মূল অংশের দেয়াল থেকে বাইরের দোকানঘর পর্যন্তই ২১ নম্বর সীমাবদ্ধ ; বিল্ডিংয়ের ভেতরের

অংশ ২৭ এবং ওপরতলায় আলাদা নম্বর (এই ঠিকানার ধরণটি ভেতরে গিয়ে পরীক্ষিত)। তাহলে কি ২১ নম্বরের দেয়ালের ইটের মধ্যেই হারিয়ে গেল আর্মেনিয়ান ক্লাব? এই আশ্চর্য 'নেই-আছি-নেই' খেলায় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই বিভ্রমে পড়বেন। তবে এর চাইতেও যে বড় বিভ্রমের দেখা মিলবে এমন কথা কে জানত!

আর্মেনিয়ান কলেজের সূত্র মারফত জানা যায় কলকাতায় বড়বাজারের প্রাচীনতম গীর্জাটিই শুধু মাত্র নয়, এ ছাড়াও আরো দুটি গীর্জা রয়েছে। একটি পার্কসার্কাস অপরটি টেংরায়। আর্মেনিয়ানদের 'বড়দিন' ৬ জানুয়ারিতে এবং অন্যান্য উৎসবে অনুষ্ঠানে প্রার্থনা করতে তাঁরা এই দুটি চার্চেই যান। তাই আগ্রহের বশে খুঁজতে লেগে যাই পার্কসার্কাসের আর্মেনিয়ান গীর্জা। আর এই ঠিকানার সন্ধান দিতে গুগলম্যাপও ফেল করে যায়। দুদিন ধরে প্রত্যহ ৩ঘন্টা করে পার্কসার্কাস-মৌলালি-বেনিয়াপুকুর তন্নতন্ন করে খুঁজেও দেখা মিলতে চায় না ! কোথায় সেই গীর্জা? প্রবীণ দুএক জন ব্যক্তি যদিওবা আর্মেনিয়ান গীর্জার খোঁজ দেন, পথ চলতে ঠিকানা গিয়ে ঘুরপাক খায় জাননগর রোড আর বেনিয়াপুকুর থানার আশেপাশের গোলোকধাঁধায়। গুগল সাইটে ঠিকানা রয়েছে, সে ঠিকানা ভুল। ফোন নম্বর দেওয়া রয়েছে যে ব্যক্তির, তিনি জানালেন এমন কোনও চার্চের কথা তিনি জানেনই না! অবশেষে মরিয়া হয়ে random search চালাতে হয়। কোথাও ছিঁটেফোঁটা ইঙ্গিত তো থাকবেই! সত্যিই যদি এই রাস্তায়একটি গীর্জার অস্তিত্ব থেকেই থাকে, রাতারাতি তো সেটা উবে যাবে না! অবশেষে ট্রাভেল ব্লগার রঙ্গন দত্তের একটি ব্লগপোস্টে সঠিক দিশা মিলল। তাঁর দিকনির্দেশ লক্ষ্য করেই আর্মেনিয়ান গীর্জার কাছাকাছি পৌঁছতে পারি। তবে নিশ্চিত করে বলা যায়, এই দিকনির্দেশ লক্ষ্য করলেও অদম্য জেদের বশে খুঁজে বার করতে না চাইলে এই গীর্জার দেখা পাওয়া কারুর পক্ষে অসম্ভব। কীভাবে বার করা গেল সেই অভিজ্ঞতা ছোট্ট করে বলেই আমাদের জার্নিতে ছেদ টানতে হবে।

ট্রাভেল ব্লগার রঙ্গন দত্তের বর্ণনা অনুসারে ‘লোয়ার সার্কুলার রোড সিমেট্রির বাউন্ডারিওয়াল বরাবর এগোতে হবে’ । বাউন্ডারিওয়াল যেখানে মিশেছে সেখানেই গীর্জাটি অবস্থিত। পড়ে মনে হল ইস্! এত সহজ? পরক্ষণেই উত্তেজনার পারদ নেমে গেল। সিমেট্রির পাহারাওয়ালা দেখিয়ে তো দিলেন পাশেই গীর্জা। কিন্তু বাউন্ডারিওয়াল, সেটা কই? উল্লেখ্য, এই বাউন্ডারিওয়ালের পাশেই ‘ইন্সটিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সে’ র বিরাট বিল্ডিং অবস্থিত। সিমেট্রির বাউন্ডারিওয়াল খুঁজতে গেলে এই বিল্ডিংয়ের দেয়ালটি চোখে হারালে চলবেনা। অতএব সেই দেয়াল ধরেই এগোনো। মিনিট পাঁচেক পর সেই দেয়ালও উধাও। কারণ বড় রাস্তাটি কখন যেন আচমকাই ভোল পাল্টে একটা ঘিঞ্জি বস্তিতে গিয়ে মিশেছে। কাল্পনিক নিরক্ষরেখার মতো সিমেট্রির বাউন্ডারিওয়ালের ছবি মনেমনে এঁকে ঢুকে পড়লাম বস্তিটায়। বস্তিটিকে মহল্লা বলা ভালো। এই মহল্লার নাম আছে কি কোন? খোঁজ করতেই এক মুসলমান প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে পড়েব ললেন, ‘হাঁ বিলকুল আছে! মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড।’ তখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি। বস্তি ছাড়িয়ে রাস্তাটা ঘুরে গিয়ে পড়ল আরেকটা বাইলেনে, যার সাবেকি নাম নর্থরেঞ্জরোড। স্থানীয় ব্যক্তি দেখালেন মডার্ণ স্কুলের পাশেই রয়েছে একটা গীর্জা।প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে ছুটে যাই। কিন্তু কোথায় গীর্জা? এটা তো একটা হাউস। ‘Sir Catchick Paul chater house.’ সিকিউরিটি জানালেন, এটাই চার্চ, এটা রেসিডেন্স এবং একটি ওল্ড এজ হোমও রয়েছে। তবে সর্বসাধারণের জন্য এখানেও বন্ধ দরজা। আর্মেনিয়ান ছাড়া সাধারণত কারুর প্রবেশের অনুমতি এই গেটের ভেতরে নেই।তাহলে গীর্জাটা একবার বাইরে থেকে অন্তত দেখতে পারি? বাড়িটির একেবারে গা ঘেঁষে সরু গলি, গলির শেষ মাথায় উঁকি দিচ্ছে লাল চূড়ো। আর গীর্জার ঠিকপাশেই হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে সিমেট্রির বাউন্ডারি দেয়াল। এখানেই এসে গীর্জার সঙ্গে পাঁচিলটি মিশে গিয়েছে। এটা ব্লাইন্ড লেন। আপাতত রাস্তাটা এখানেই শেষ।এখনকার মতো এই পর্যন্তই।

লেখা ৩

মৃণাল সেন : প্রাইভেট মার্কসিস্ট?

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

কলকাতা-কে নিয়ে এক ডকুমেন্টারি করেন মৃণাল সেন। নাম- 'ক্যালক্যাটা মাই এল ডোরাডো' । এর আগেই অবশ্য জার্মান চলচ্চিত্র পরিচালক রাইনহার্ড হাউফ যখন কলকাতায় আসেন তখন এক বন্ধের দিনে কলকাতার রাজপথে আরাম করে শুয়ে পড়ে হাউফের ক্যামেরার সামনে তিনি বলেন, ' কলকাতাকে ছাড়া আমি নিজেকে আমি ভাবতে পারি না। কলকাতা আমার এল ডোরাডো। আমার প্রতিবাদ,আমার সাফল্য,আমার ব্যর্থতা,আমার আবেগ,আমার উত্তেজনা সবই জড়িয়ে আছে এই শহরকে নিয়ে, আমার প্রিয় কলকাতাকে নিয়ে। ' এই রকম একজন মানুষ কলকাতাকে নিয়ে তথ্যচিত্র তোলার সময় যে শিরোনাম দেবেন 'ক্যালক্যাটা-মাই এল ডোরাডো' এটা স্বাভাবিক। কলকাতা তাঁর কাছে সত্যিই সব পেয়েছির দেশ। হলান্ডের সিটি ফাউন্ডেশন পৃথিবীর দশটি শহরকে নিয়ে সিনেমা বানাবে বলে যখন ঠিক করে তখন তাঁরা সেইসব শহরের সেরা দশজন নাগরিক পরিচালককে বেছে নেন। ভারতের প্রাণের শহর কলকাতাকে নিয়ে ছবি করার জন্য তাঁরা অনুরোধ করেন মৃণালকেই। কেননা মৃণাল মনেপ্রাণে নাগরিক পরিচালক। মৃণাল-চর্চায় খুব বেশি চর্চিত নয় এই ছবি। ১৮ মিনিটের কলকাতা নিয়ে এই তথ্যচিত্রে তাঁর প্রাণের শহরকে ঠিক কীভাবে উপস্থিত করতে চান পরিচালক মৃণাল সেন ? এক প্রাণবন্ত আড্ডায় এই কথা জানতে চাই স্বয়ং তাঁর কাছেই। যে কোনো আড্ডায় তিনি তো কথাপুরুষ। গভীর কথাও সহজে বলে দিতে

পারেন। তাঁর কথোপকথনে থাকত ইংরেজি ও বাংলার অবাধ মিশেল। অথবা সরাসরি ইংরেজি। যেমন তাঁর এই তথ্যচিত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ছবির পোস্টারের জন্যে আমি যে ট্যাগ লাইন লিখি তার মধ্যেই রয়ে গেছে ছবির প্রাণ-ভোমরা। ট্যাগ লাইনটি হল- 'The mega-city of Calcutta is a city abounding with contrasts: overcrowded and empty, poor and rich, with floods and draughts alternating. The city as a fermenting organism that grows and flourishes and always excites. A city to love and to hate'

জন্ম কিন্তু মৃণাল সেনের কলকাতায় নয়। অধুনা বাংলাদেশে। ১৪মে ১৯২৩। ফরিদপুরে। বাবা দীনেশ সেন,পেশায় আইনবিদ,ঘনিষ্ঠ ছিলেন চরমপন্থী কংগ্রেসিদের সঙ্গে। শৈশব কৈশোর সেখানেই। সেই সূত্রে নেতাজি সুভাষচন্দ্র আসতেন তাঁদের বাড়িতে। স্কুল জীবন, প্রাথমিক কলেজ জীবন ওখানেই। ১৭ বছর বয়সে কলকাতায় এলেন। চল্লিশের দশক। কলকাতায় নেমেছিলেন এক ভয় মেশানো বিস্ময় নিয়ে।এই বিস্ময়টার সঙ্গে মৃণালদা তুলনা টানেন 'অপরাজিত' -র অপুর সেই প্রথম কলকাতা দেখার। সেই যে হ্যারিসন রোডে দাঁড়িয়ে ভয়-বিস্ময় ভরা চোখে অপু প্রথম কলকাতা দেখছে -- ঠিক সেই রকমই অনুভূতি। মৃণাল সেনের ভাষায়, 'শহরের এই উদাসীন জনস্রোত আমার কাছে কেমন নামগোত্রহীন আত্মমুখী এমনকি বেশ ভীতিজনক আর ভয়ংকর ঠেকত।'

এই ভয় কেটে যেতে খুব একটা সময় লাগেনি মৃণালের। ক্রমেই তিনি কলকাতার আপন হয়ে ওঠেন, আপন করে তোলেন কলকাতাকে। এক ভয়ংকর যুগ সন্ধিক্ষণে কলকাতায় আসেন তিনি। কলকাতায় তাঁর যৌবন কাটছে এক উত্তাল সময়ে- নৌবিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ,দেশভাগ, দাঙ্গা, মধ্যরাত্রির স্বাধীনতা। এইসব স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসের গতানুগতিক ধারায় বিরাট ধাক্কা আনে। বিজ্ঞানের ছাত্র মৃণাল, যুক্তিভাবনা থেকেই মার্কসের দর্শনের প্রতি টান। তাই কলকাতায় কলেজজীবন শেষ করে জড়িয়ে পড়লেন ধর্মতলার গণনাট্যের আড্ডায়। পকেটে কোনো পার্টি-কার্ড না নিয়েই জড়িয়ে পড়লেন বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে। সরাসরি কোনো দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হয়েই তিনি আজীবন বাম-ভাবনায় বিশ্বাসী। শেষের দিকে নিজেকে বলতেন তিনি প্রাইভেট মার্কসিস্ট। তাঁর কাছে সিনেমা সেই চিন্তারই প্রাকটিস। পাশাপাশি জীবিকা হিসেবে শুরুতে টিউশনি পরে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টিটিভ। মৃণাল যখন নির্মম কলকাতায় বাস করছেন তখন বাংলা সিনেমায় কিন্তু সে নির্মমতার কোনো ছোঁয়া নেই। বরং এক অলীক জগতেই তার বাস। এইরকম এক সময়ে গণনাট্যের কিছু

মানুষ জড়িয়ে পড়লেন টালিগঞ্জের বাংলা সিনেমায়। আর সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে মৃণালের আকর্ষণ তো সিনেমাতেই। নিয়মিত রুটিনে-এ আছে সিনেমা সংক্রান্ত বই পড়া, আর ফিল্ম ক্লাবের সৌজন্যে নিয়মিত দেশ বিদেশের ছবি দেখা।

মৃণালের চোখে তখন সিনেমা তৈরির স্বপ্ন। আর সেই সূত্রেই পা টালিগঞ্জে। গণনাট্যের ক' জন মিলে বাংলা ছবি পরিচালনা করতে যান। সেটা ১৯৫০ সাল। ছবির নাম 'দুধারা' । পরিচালক হিসেবে এই গোষ্ঠীর নাম ছিল 'অনামী' । কাহিনি ও চিত্রনাট্য মৃণলেরই। আর এখানেই দেখা গীতা সোমের সঙ্গে। যিনি আর কিছুদিনের মধ্যে হয়ে উঠবেন তাঁর অর্ধাঙ্গিনী। আলাপ হয়েছিল সিনেমার সূত্রেই। গীতা সোমের নিজের কথায়, 'আমার প্রথম ছবি 'দুধারা' । পূর্ব বাংলার বা এখনকার যে বাংলাদেশ, সেখান থেকে একটা নতুন দল এসেছিল, উনিশশো ছেচল্লিশ বা সাতচল্লিশে বোধ হয় তাঁরা ঐ ছবিটা তৈরি শুরু করেন। উনিও ছিলেন ওঁদের সঙ্গে। ওঁরই লেখা গল্প, ওঁর সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতও ঐ ছবি থেকে।'

'এক সোম আমায় জীবন দিয়েছে। আরেক সোম আমায় প্রতিষ্ঠা' , মৃণাল সেন নিজেই এই কথা বার বার বলতেন। এক সোম মানে গীতা সোম। আর আরেক সোম হল ভুবন সোম। মৃণালের প্রথম ও শেষ প্রেমিকা গীতা। গীতা সোম। তাঁর জীবন-সঙ্গিনী। গীতার সঙ্গে প্রেম-প্রসঙ্গে মৃণাল নিজেই বলেন, 'গীতার সঙ্গে উত্তরপাড়াতে দেখা করতে যাওয়ার পথে হুইলার থেকে একটা বই কিনলাম। এ ফেস অফ কমিউনিজম। বালির ব্রিজের ওপর দিয়ে দুজনে হাঁটছি। সেদিন হঠাৎ গীতার হাত ধরে তাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করলাম। প্রচণ্ড নার্ভাস ছিলাম, ঠোঁটটা পড়ল ওর নাকের ওপর, আর হাত কেঁপে 'এ ফেস অফ কমিউনিজম' ঝপাৎ করে গঙ্গার জলে গিয়ে পড়ল। আমার প্রথম চুম্বনের সঙ্গে কমিউনিজেমের যুক্তির বেড়াজাল গঙ্গায় ভেসে গেল।' এইভাবেই কথাপুরুষ কথা বলতেন। যুক্তি , হিউমার এবং আত্মসমালোচনায়। এই গীতাকেই বিয়ে করেন মৃণাল। আর সত্যজিৎ যেমন প্রথম ছবি থেকেই প্রতিষ্ঠা পান, মৃণালের কিন্তু তা নয়, মৃণালকে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ তেরো বছর।

'ভুবন সোম' ছবি থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠার শুরু। কলকাতাকে ঘিরেই মৃণালের জীবন। ফরিদপুর থেকে যখন কলকাতায় আসেন তিনি, তখন একদিকে যেমন ভয়মিশ্রিত বিস্ময় ছিল তেমনই তাঁর মনে হয়েছিল 'যেন এক শামুকের খোল ভেঙে বেরিয়ে এসেছি, দমবন্ধ অবস্থা থেকে যেন এক খোলা পৃথিবীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে বড়ো

করে নিশ্বাস নিতে পারছি। তার মানে কলকাতা তাঁর কাছে এক খোলামেলা জগৎ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। সংস্কৃতির নানা পরিসরের মানুষদের কাছাকাছি আসছেন তিনি। দক্ষিণ কলকাতার 'প্যারাডাইস ক্যাফে' -তে চলত ক্রিয়েটিভ আড্ডা। সেই আড্ডায় থাকতেন পরবর্তীকালের সংস্কৃতি জগতের নামকরা মানুষেরা। যেমন ঋত্বিক ঘটক, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি, বংশী চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ। এইভাবেই কলকাতা শহরই তৈরি করে দিচ্ছিল মৃণালের নাগরিক মনন। আর এই নাগরিক মনন আঁকড়ে এই শহরেই আমৃত্যু থেকেছেন মৃণাল সেন। আর নিজেকে আগমার্কা কলকাত্তাইয়া বলে দাবি করে গেছেন। কিন্তু তিনি তো আউটসাইডার, এতটা ইনসাইডার হলেন কী করে ? এক সযত্ন নিজস্ব চর্চার মধ্যে দিয়েই মৃণাল আবিষ্কার করে নিয়েছেন আউটসাইডার থেকে ইনসাইডার হয়ে ওঠার পথ। এই ভাবেই মৃণাল কলকাতার হয়ে ওঠেন, কলকাতা হয়ে ওঠে মৃণালের। পরে তাজ গ্রুপ যখন কলকাতায় হোটেল খোলে, তখন কলকাতাকে তার ক্লায়েন্টদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে মৃণাল সেনকেই অনুরোধ করে। মৃণাল সেন সেই উপলক্ষ্যে লেখেন, 'কলকাতা। এই নগরীর তারুণ্য ও প্রাণোচ্ছলতা, এর চাপল্য এবং এর অস্তিত্বের এক বিয়োগান্তক মাত্রা আমাকে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে। একদিন আমি এই শহরে পথহারা আগন্তুকের মতো প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু আজ আমি কলকাতাসক্ত, বিনা দ্বিধায় আমি বলতে পারি কলকাতাই আমার সব পেয়েছি-র দেশ। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক নগরীর মতো কলকাতাতেও অনেক বৈপরীত্য, বহু স্ববিরোধের সন্ধান পাওয়া যাবে। পুরাতন ও নতুনের আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে। যার জন্যে কিছুটা দায়ী অবিরাম নগরায়নের

প্রয়াস,কিছুটার কোনো কারণ পাওয়া যাবে না। অন্যান্য অনেক শহরের মতো এ-শহরও মানুষে ঠাসা। সব রকম মানুষ এখানে পাওয়া যাবে ---সুন্দর ও কুৎসিত, সবল ও দুর্বল, দৃঢ়চেতা এবং দোদুল্যমান,গম্ভীর ও হাস্যময় --- সব কিছু। এই শহর বিশাল ও জটিল, ঘোরতর কর্মব্যস্ত এবং অবিশ্বাস্যরকম অলস, হিংস্রভাবে রাজনীতিসচেতন অথচ আশ্চর্যরকম উদাসীন।' কলকাতাকে নিয়ে এই রকমই ভাবেন তিনি। তিনি মনেপ্রাণে ক্যালকেশিয়ান। আর এই নাগরিক মনন তিনি তৈরি করেছেন দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। মৃণাল ধীরে ধীরে কলকাতাকে ভালোবাসতে শুরু

করেন, একটা সময় তিনি বুঝতে পারেন কলকাতাকে ভালো না বেসে তাঁর আর কোনো উপায় নেই। মুগ্ধ বিস্ময়ে আবিষ্কার করতে থাকেন কলকাতার নানা রূপ। ‘কখনো সে মহান,কখনো উদার,কখনো নীচ,কখনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত,কখনো আচ্ছন্ন,কখনো কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণকারী,কখনো যন্ত্রণাকাতর,কখনো হাসিতে ঝলমল,কখনো ধীরোদাত্ত,কখনো উদ্দাম।’

এই শহর কলকাতাতেই থাকতেন মৃণাল সেন। এখন আর মৃণাল সেন নেই এই শহরে নেই, নেই এই গ্রহেই । কলকাতা তাঁর কাছে ছিল এল ডোরাডো। সব পেয়েছির দেশ। প্রেমের শহর। কলকাতার অসুখে তিনি যন্ত্রণা পেতেন,কলকাতার সুখে তিনি আহ্লাদিত হতেন। এই শহর কলকাতার মানুষটি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন আন্তজার্তিক। সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ছিল তাঁর বন্ধু। যেমন উপন্যাসে যিনি এনেছেন জাদু-বাস্তব সেই মার্কেসের সঙ্গে তাঁর ছিল অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব। বাঙালি তাঁকে চেনার আগেই মার্কেসের গল্প শুনেছি মৃণালদার মুখে। মার্কেস চেয়েছিলেন তাঁর গল্প নিয়ে ছবি করুন মৃণাল। সে ছবি অবশ্য হয়নি শেষ অবধি। এসব গল্প মৃণালদার মুখেই শোনা। তিনি ছিলেন কথাপুরুষ। দারুন আড্ডাবাজ। আর যে আড্ডার প্রতিটি মুহূর্তেই সৃষ্টিময়।

যে কোনো বয়সের মানুষের সঙ্গে অনায়াসে কীভাবে কখন যেন মিশে যেতেন মৃণালদা। আর সেটা হয়ে উঠত সাহিত্য সিনেমা নিয়ে অবাধ গতিময় আড্ডা। যাঁরা মৃণালদার সঙ্গে আড্ডা মেরেছেন তাঁরা জানেন এই আড্ডা হয়ে উঠত কী অনন্য।

সাম্প্রতিক দুনিয়ার অলিগলির সন্ধান রাখতেন তিনি। তিনি ছিলেন সবসময় এক তাজা তরুণ। বয়স তাঁকে কখনই ছুঁতে পারেনি। কিন্তু শেষ এক যুগ নিজেকে তিনি এক অদ্ভুত অভিমানে গুটিয়ে নেন নিজের চার দেওয়ালের মধ্যে। ক্রমশই পরে চার দেওয়ালের মধ্যে এক বিছানায়। হয়ত বয়সজনিত কারণেই কিছুটা। এই সময় তিনি যেন সামান্যতম শারীরিক কষ্ট না পান সেই জন্যেই তাঁকে ঘিরে ছিল বেশ কিছু মনের দিক থেকে তরুণ বিপ্লবী যুবক। কর্মসূত্রে এঁরা সকলেই চিকিৎসক। এঁদের মধ্যে একজন ডাক্তার অধৃষ্যকুমার। একদা সতত কথাময় মৃণালদা এক বিছানায় স্মৃতিহীন। কিন্তু সজাগ ছিল তাঁর সম্মান এবং অভিমান-বোধ। মৃত্যুর আগে তাই পুত্র কুণালকে জানিয়ে যান যে মৃত্যুর পর কোনো সরকার বা প্রতিষ্ঠান যেন তাঁর শেষ যাত্রার তদারকি না করে। ফুল বা মালা দেওয়ার জন্যে যেন তাঁর দেহ শায়িত না করা হয় কোনো তথাকথিত সাংস্কৃতিক পরিসরে। তাঁর মৃত্যুর সময় পুত্র কুণাল ছিলেন বিদেশে।

কুণাল বাবা মৃণাল সেন-কে ডাকতেন বন্ধু বলে। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮-এর সকালে তাঁর মৃত্যু। পুত্র কুণালের আসার অপেক্ষায় দেহ রেখে দেয়া হয় 'পিস-হেভেন' -এ। শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয় ১ জানুয়ারি ২০১৯। আর এই শহরে নেই নাগরিক মৃণাল সেন। কোনো আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি ছিল না। ছিল না মিডিয়ার ঝলকানি। পুত্র কুণাল ফেসবুকে ছোট এক পোস্ট দেন কেবল : ' আমার বাবা বার বার বারণ করে গেছেন যে তাঁর মৃত্যুর পর শেষ যাত্রায় যেন আতিশয্য না হয়। তাই আমাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করা উচিত। তাই আমরা বিকেল ৩টের সময় দেশপ্রিয় পার্কের সামনে একসঙ্গে মিলে বাবার শেষকৃত্যের পথে যাব। ' কলকাতার বিদগ্ধ মানুষেরা এই মিছিলে সামিল হন, কোনো সরকারি ঘেরাটোপে নয় পদাতিক-এর সঙ্গে তাঁরা সামিল হন স্বাধীন-চেতনায়। তাঁর স্মৃতি-সভাতেও ছিল না কোনো ফুলের চিহ্ন, ছিল না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক হাত। ৭৭ বছরের কলকাতা জীবন। তরুণ থেকে তরুণতর-রা তাঁর বন্ধু। যে কনো নতুন ভাবনাই তাঁর কাছে ছিল সদা স্বাগত। যেসব বিদেশি পরিচালক কলকাতা নিয়ে ছবি করতে চেয়েছেন তাঁরাই প্রথম যোগাযোগ করেছেন মৃণালের সঙ্গে।

২ মৃণাল সেন সারা জীবনে ৩০টি ফিচার ছবি করেছেন। তার মধ্যে ১৪টার পটভূমি কলকাতা। এই ১৪টি ছবি হল-পুনশ্চ, অবশেষে, প্রতিনিধি, আকাশকুসুম, ইন্টারভিউ, কলকাতা' ৭১,পদাতিক, কোরাস, পরশুরাম, একদিন প্রতিদিন, চালচিত্র, খারিজ, একদিন অচানক, মহাপৃথিবী। সময়কাল ষাটের দশক থেকে আশির দশক। মাঝখানে রয়েছে কলকাতার সেই উত্তাল সময় --- সত্তরের দশক। আর এই সত্তরই তো কলকাতা নিয়ে সবচেয়ে অ্যাকটিভ মৃণাল। ঠিকই পুনশ্চ, অবশেষে বা প্রতিনিধি --- কলকাতা পটভূমি হলেও কলকাতা যথার্থ অর্থে ছবির চরিত্র হয়ে ওঠেনি। এই তিনটি ছবি টালিগঞ্জের তৎকালীন চালু ঘরানা থেকে খুব যে আলাদা ছিল তা নয় ,কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল প্রচলিত ছকের মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন পরিচালক চলচ্চিত্রে তাঁর নিজস্ব ভাষা খুঁজতে ব্যস্ত। আর সেটাই প্রমাণ হল 'আকাশকুসুম' -এ। কলকাতা হয়ে উঠল ছবির এক বিশেষ চরিত্র। এই সেই কলকাতা , যেখানে মধ্যবিত্তরা সবসময় স্বপ্ন দেখে শ্রেণি চরিত্র বদলাবার। রাতারাতি বিত্তশালী হয়ে ওঠার। কলকাতাই তাদের এই স্বপ্ন দেখায়। যেখানে প্রেম ভালোবাসাতেও এসে যায় মিথ্যের আশ্রয় । এই ছবির আঙ্গিকে মৃণাল নিয়ে আসেন এক অন্যতর আঙ্গিক। বিষয়গত প্রশ্নে স্বয়ং সত্যজিৎ রায় প্রশ্ন তোলেন এই ছবির টপিক্যালিটির প্রশ্নে। মৃণালও চলে আসেন এই পলেমিক-এ। এরপর সিনেমার ন্যারেটিভ-কে ভাঙলেন তিনি। হয়ত জর্মন নাট্যকার বেট্রোল্ট ব্রেখট-এর নাট্য-টেকনিকের খানিক প্রভাবও পড়ল তাঁর ছবিতে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা ---

কলকাতা শহর বিশেষভাবে এক চরিত্র হয়ে উঠল এই ছবিতে।যেমন কলকাতার রাস্তা, ট্রাম, বাস, দোকান-পাট, প্রিন্সেপ ঘাট প্রমুখ সবকিছুই 'ইন্টারভিউ' ছবির চরিত্র। এইভাবে কলকাতা শহরকে এর আগে কোনো বাংলা ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়নি। এবং এর পরেই তো এল মৃণালের সেই কলকাতা-ট্রিলজি। কলকাতা' ৭১, পদাতিক, ও কোরাস। মৃণালের ক্যামেরা কলকাতার অলিতে গলিতে ঘুরল। মৃণালের ছবি ৭০-এর কলকাতা ঘিরেই রাজনৈতিক হয়ে উঠল। সেই সময়ের বিপ্লবের কলকাতা, বুরোক্রাসির কলকাতা, ভায়োলেন্সের কলকাতা,সন্তাসবাদের কলকাতা --- সবকিছুই ধরা পড়ল তাঁর ছবিতে। অনেকটা যেভাবে ফরাসি নব তরঙ্গের পরিচালক তাঁর নিজের শহর প্যারিসকে আবিষ্কার করেন, সেইভাবেই যেন কলকাতাকে আবিষ্কার করেন মৃণাল সেন। আবার ট্রিলজি-'একদিন প্রতিদিন' ,'খারিজ' , 'একদিন অচানক' । এই আবসেন্ট ত্রিলজি –র সবকটিতেই কলকাতা ফিরে ফিরে আসে। এবার মৃণাল কলকাতার মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্লেষণে মন দেন। 'একদিন প্রতিদিন' -এ একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ে,যার ওপর তার সংসার নির্ভরশীল, সে একদিন রাতে বাড়ি ফেরে না। আর এই সূত্র ধরে মৃণালের ক্যামেরা অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকের মতো ঘুরে বেড়ায় রাতের কলকাতায়। এইভাবেই দ্বিতীয় ছবিতে বাড়ির চাকর রাতে রান্নাঘরে বিষাক্ত গ্যাসে মারা যায়। এরপরেই শুরু হয় কলকাতার মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্লেষণ। এবং 'একদিন অচানক' -এ বাড়ির কর্তা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। এখানে বার্লিন প্রাচীর ভাঙার পরিপেক্ষিতে কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প বলেন মৃণাল। এ যেন মৃণাল সেনের নিজেরই আত্মবিশ্লেষণ। আর 'পরশুরাম' তো কলকাতার ফুটপাথের বাসিন্দাদের এক অন্য জগৎ।

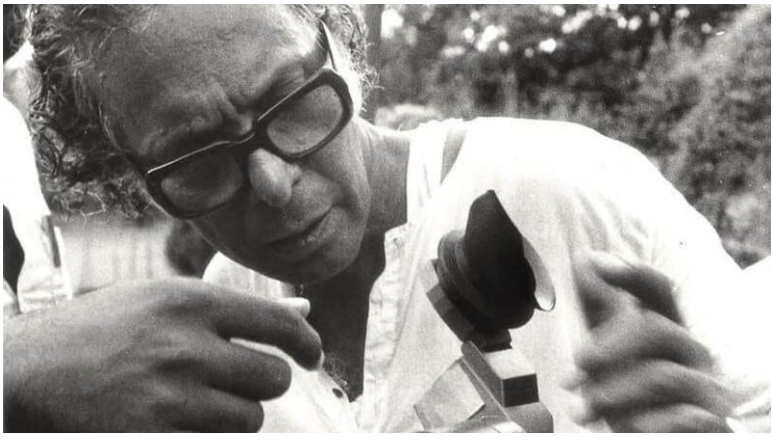

১৯৬৮ সালে ফরাসি পরিচালক লুই মাল কলকাতায় এসে সেই মৃণালকেই ধরেন। কলকাতা তখন মিছিল আর আন্দোলনের শহর। মৃণাল সেন তখন একটা ৩৫মিমি ক্যামেরা জোগাড় করে আন্দোলন বা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ছবি তুলে চলেছেন। এইসব ফুটেজ পরবর্তী সময়ে তাঁর কলকাতা ট্রিলজি-তে তিনি ব্যবহার করেন। এই ধরনের ফুটেজের ব্যবহার ভারতীয় সিনেমায় সেই প্রথম। এদিকে এইরকম এক সময়ে কখনও কখনও

লুই মাল-ও সঙ্গে থাকতেন। তিনি বলেন, এই উত্তেজনা এক বিশিষ্ট চরিত্র দেয় কলকাতা-কে। তবে কলকাতাকে ঘিরে অন্যান্য দেশের শহরেও চলে যান মৃণাল। যেমন নানা ছবিতে তিনি ব্যবহার করেন আফ্রিকা বা ভিয়েতনাম শহরের ফুটেজ। এইভাবেই তিনি সিনেমায় কলকাতার বিশ্বায়ন ঘটান।

লেখা ৪

মৃণালদা ছিলেন আমার কাছে শিক্ষকের মতো

রাজা সেন

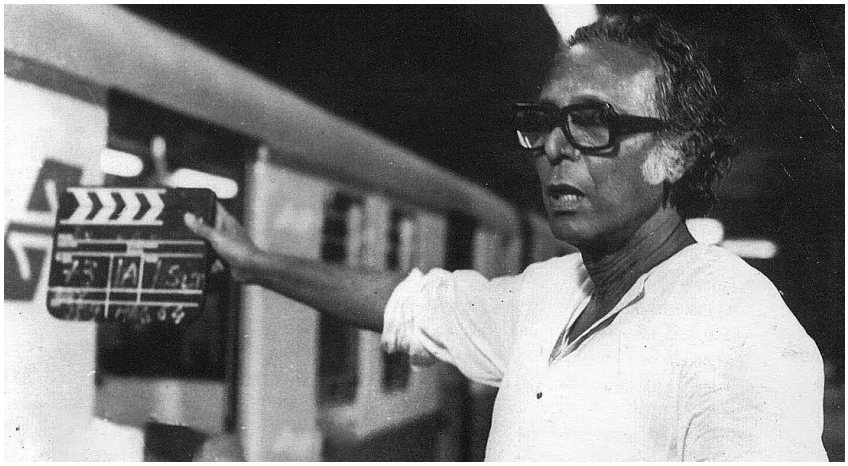

আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের ব্যাখ্যা দিতে গেলে একই সঙ্গে আমার চলচ্চিত্র পরিচালনার গোড়াঘরের কথাই এসে যাবে। কেননা মৃণাল সেন ছিলেন আমার কাছে শিক্ষকের মতো। আমি যখন সিনেমার 'অআকখ' পর্যন্ত জানতাম না, তখন থেকেই মৃণাল সেনের সঙ্গে আমার পরিচয়। সৌভাগ্যক্রমে আমি থিয়েটারে অভিনয় করতাম। থিয়েটারের সূত্রেই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ভীষণ কাছাকাছি ছিলাম। মোহিতদার সঙ্গেই থিয়েটার নিয়ে আড্ডা, ঘুরে বেড়ানো এসব চলত। তখন তো বেকার জীবন। কলেজ থেকে পাশ করে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেকারত্বের সেই সময়টায় গ্রুপ থিয়েটার করতাম, আর মোহিতদার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। সেইসময়েই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমেই মৃণাল সেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

তখনও পরিচালনা থেকে আমি অনেক দূরে। মোহিতদার সঙ্গে দেশপ্রিয় পার্কের পাশে মৃণাল সেনের বাড়িতে একদিন যে যাই , তা-ও মূলত অভিনয়ের জন্য। অভিনয় নিয়ে কথা হল, আড্ডাও চলল। ছিলাম সেই আড্ডায়। তখন প্রচুর ছেলেপুলে আসত মৃণাল সেনের বাড়িতে। রাউন্ডের পর রাউন্ড চা এসে যাচ্ছে। শতরঞ্জি বিছিয়ে ছেলেরা বসে, মৃণাল সেন বসে সোফায়, জমিয়ে আড্ডা চলছে– এই দৃশ্য ছিল একেবারে ধরাবাঁধা। প্রথমদিনের সেই আড্ডায় সময় কাটিয়ে ফেরার সময়ে মৃণাল সেনের কাছে প্রস্তাব দিই, 'আপনি যদি অনুমতি দেন আমি কি মাঝেমধ্যে আপনার কাছে আসতে

পারি?' তখন উনিই বলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মাঝেমধ্যে কেন ! তুমি একদিন অন্তরই আসবে।'

কী কারণে আমাকে উনি এত ভালোবেসেছিলেন জানি না। যাই হোক, আমি প্রায় নিয়মিতই যাওয়া শুরু করাছিলাম। ভীষণ ভালো লাগত। ওঁদের আড্ডায় থাকতাম। হাঁ করে কথাবার্তা শুনতাম। এরপর মৃণাল সেনের ছবি 'একদিন প্রতিদিন'-এ একটা ছোটো রোল পাই। তখন কাস্টিং কমপ্লিট। তবুও উনি আমাকে একটা পুলিশ অফিসারের রোল দিলেন। সহঅভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পর্দায় আমি। এক্ষেত্রে যে কথাটি বিশেষ করে বলার, নিজের অভিনয় ছাড়াও সিনেমার শ্যুটিংয়ে সবসময়ই যাতায়াতের অনুমতি আমার ছিল। সেই সূত্রে একটা গোটা চলচ্চিত্রের শ্যুটিং সেই প্রথম আমার কাছ থেকে দেখা।

এরপর 'আকালের সন্ধানে' করলেন মৃণাল সেন। সেখানেও আমি একটি পুলিশ অফিসারের রোল করেছি। ছোট্ট পার্ট হলেও চরিত্রটি সিনেমায় কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চালপাচারের দৃশ্যে সংলাপগুলি ছিল চমৎকার। তার চেয়েও বড়ো কথা, এবারেও উনি আমাকে পুরো শ্যুটিংয়েই থাকতে অ্যালাউ করলেন। আউটডোর ছিল। কালনা-কাটোয়া লাইনে সোমরাবাজার নামে একটি জায়গায় এক জমিদার বাড়িতে শ্যুটিং। এই সিনেমার গোটা শ্যুটিংটিতেই আমি মৃণাল সেনের অবজার্ভার হিসেবে সঙ্গে ছিলাম। থাকা খাওয়া থেকে শুরু করে যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা ছিল। আমি, জয়ন্ত চৌধুরী নামে একজন অসামান্য অভিনেতা ছিলেন, ধৃতিমান চ্যাটার্জি ছিলেন। কখনও হয়তো সামান্য দু-একটি সাধারণ কাজে মৃণালদাকে সহায়তাও করেছি। সেটা খুবই সামান্য, তবে এই অবজারভেশন থেকেই আমার মধ্যে ধীরে ধীরে পরিচালনার দিকে ঝোঁক আসে।

এরপর আমিও টুকটাক কাজ শুরু করি। প্রথমদিকে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর সঙ্গে কাজ করেছি। ধৃতিমান চ্যাটার্জির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হল । ওঁর ডকুমেন্টরি ছবিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের কাজ করলাম। মৃণালদা আমাকে কাজ নিয়ে ভীষণ উৎসাহ দিতেন। আমার চলচ্চিত্র পরিচালনার বিভিন্ন দিক খুঁটিয়ে দেখতেন মৃণালসেন। প্রশংসা করতেন, প্রয়োজনীয় মতামতও দিতেন। আমার 'দেবীপক্ষ

’ ছবিটি দেখে মৃণালদা বলেছিলেন, ‘একটাই ছোট ঘর নিয়ে তুমি কাজ করেছ। অথচ তার মধ্যে যেন গোটা পৃথিবীটারই দেখা মিলছে ।’ সেইসময়ে আমরা যারা তরুণ থেকে যুবক বয়সে পদার্পণ করছি, এমন কয়েকজনকে নিয়ে ওঁর মধ্যে একটা এক্সপেকটেশন তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা ভালো ছবি তৈরি করব। এরপর আমি টিভি সিরিয়ালের কাজ শুরু করি। সেইসময়েও নিয়মিত আমার কাজ দেখতেন। আমাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন ‘টিভির রাজা’ । আসলে ব্যাপারটা হল ফোনের কন্ট্যাক্ট গ্রুপে একই নামে অনেক ব্যক্তি থাকলে তিনি আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত করে রাখতেন। সেইসূত্রেই আমি তাঁর কাছে ‘টিভিররাজা’ হয়ে যাই। বরাবর এভাবেই তাঁর অকুন্ঠ উৎসাহ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা পেয়েছি।

এবার আসি বাংলা চলচ্চিত্রে মৃণাল সেনের অবদান প্রসঙ্গে। বাংলা সিনেমায় ওই মানুষটার অবদানের কথা তো সংক্ষেপে বলে শেষ করার নয়। মৃণাল সেন তাঁর সমসাময়িক চিত্রপরিচালকদের থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম ছিলেন। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ যে ন্যারেটিভ স্টাইলে ছবি করেছেন (নিঃসন্দেহে সেইসব কাজগুলিও প্রশংসনীয়)--মৃণাল সেন সেই ন্যারেটিভ স্টাইলটাকে সম্পূর্ণ ভেঙে নিজস্ব আঙ্গিক তৈরি করেছিলেন, অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। সেইসময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে ‘নিউওয়েভ’ এসেছিল তাঁরই হাত ধরে। পরবর্তীকালে শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নিহালনি, সৈয়দ মির্জা --- এঁদের সকলের পথিকৃৎ বলা যায় মৃণাল সেনকে। মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র আক্ষরিক অর্থেই ভিন্ন ধারার কাজ।

আমিও তো ন্যারেটিভ স্টাইলেই ছবি করেছি, এই ধারাটিই আমার পছন্দের। তবে মৃণাল সেনের এই ভিন্নতা অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছে। উদাহরণ রূপে 'কোরাস' সিনেমাটির কথা বলতে হয়। বাংলা কেন, সারা ভারতে এই ধারার চলচ্চিত্র এর আগে তো কখনও হয়নি। পরবর্তীতে অবশ্যই আকালের সন্ধানে, চালচিত্র, খারিজ সিনেমাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রাখে। আরেকটি আশ্চর্য ব্যাপার হল -- শ্যুটিংয়ের সময় মৃণাল সেন কখনো স্ক্রিপ্ট হাতে রাখতেন না। চিত্রনাট্য একটা তো লেখা হতই, তবে বহুবার বহু সময়ে শ্যুটিং ফ্লোরে শ্যুটিং চলাকালীন সেই চিত্রনাট্যের পরিমার্জনা করে দিতেন। প্রয়োজনে ডায়লগ বদলানো, দৃশ্যে সংযোজন ইত্যাদি তো প্রায়শই ঘটত। সিন করতে গেছেন, সিচ্যুয়েশন অনুযায়ী কোনো নতুন অ্যাঙ্গেল মাথায় এল।এরকম হলে মৃণালদা তৎক্ষণাৎ সেটা প্রয়োগ করতেন। এই বৈশিষ্ট্যও তাঁকে অন্য পরিচালকদের থেকে আলাদা করেছে। সত্যজিৎ রায় যেমন চিত্রনাট্যে নিপুণ ফ্রেমওয়ার্ক করতেন, সেইমতো এগোতেন,সচরাচর তার বাইরে যেতেন না ; কিন্তু মৃণালদা তা

করতেন না। তিনি ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ততায় বিশ্বাসী। মৃণালদা একেবারেই রিজিড ছিলেন না। রিজিডিটি তাঁর মধ্যে দেখা যেত না। তাঁর কাজের মধ্যে , ভাবনার মধ্যে ফ্লেক্সিবিলিটি ছিল। এইটা মৃণালদার থেকে আমি নিজেও আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছি। নিজের ছবির ক্ষেত্রে এই ধরণের স্বতঃস্ফূর্ততা অনেকসময়েই প্রয়োগ করেছি আমি। ক্লাসিক্যাল বা ন্যারেটিভ স্টাইলের মধ্যেও ইম্প্রোভাইজ করার চেষ্টা করেছি।

মৃণাল সেনের ছবি দেখতে গিয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এই সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের কাজের অনুপ্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেলেন? খুব সরলীকৃত উত্তর দেওয়া মুশকিল। বিশ্বচলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে গোদার এই ধরনের ছবি করেছেন।

মৃণাল দেশি বিদেশি বিভিন্ন সিনেমা দেখতেন ,হয়তো সেইসব বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণ ঘটেই এক অনন্য রসায়ন তৈরি করেছিল তাঁর মননে,যা ধরা দিয়েছিল তাঁর সিনেমায়। তবে এই রসায়নে তিনি কিন্তু নিজস্বতা হারাননি। পরবর্তীকালে আমরা মৃণাল সেনের ছবি নিয়ে এত যে আলোচনা করছি, আমি এবং বহু চলচ্চিত্রকার তাঁকে পথপ্রদর্শক মনে করেছেন সেটা মৃণাল সেনের ওই নিজস্বতার জন্যই। বাংলা চলচ্চিত্র মৃণাল সেনের কাছে অশেষভাবে ঋণী থাকবে। আর খুব কাছ থেকে দেখার সুবাদে জানি, চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের পাশাপাশি মানুষ মৃণালদাও ততটাই স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন।

অসম্ভব আড্ডাবাজ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন মৃণালদা। আমাদের মতন অল্পবয়সীদের সঙ্গই পছন্দ করতেন বেশি।সত্তর-আশি দশকের রোমান্টিসিজমের সেই অস্তাচল গমনের যুগে আমরা অল্পবয়সীরাই তাঁকে ঘিরে থাকতাম। একসঙ্গে চা-সিগারেট খেতাম। সেই দলে তাঁর ছেলে নিজেও ছিল।বাবা-ছেলে পাশাপাশি বসেই সিগারেট খেতেন, পরস্পরকে সম্বোধন করতেন বন্ধু বলেই।একটা প্রাণখোলা অবাধ স্বাধীনতার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিলেন মৃণালদা। রকের মতো, চায়ের দোকানের মতোই লাজলজ্জাবিহীন খোলামেলা আড্ডা চলত আমাদের। মৃণালদা নিজেও তেমনই ছেলেমানুষের মতো সকলের সঙ্গে মিশে যেতেন।

আরেকটি কথা মৃণালদা সম্পর্কে না বললেই নয়।সেটা তাঁর অসাধারণ সেন্স অফ হিউমার। তরুণ মজুমদারের একটি উক্তি দিয়ে আলোচনাটি শেষ করব।তরুণ মজুমদার একবার আমাকে বলেছিলেন, ‘ মৃণালদার যে সেন্স অফ হিউমার, সেটা যদি উনি সিনেমায় লাগাতেন তাহলে ছবিগুলি অনেক বেশি জনপ্রিয়তার দিকে যেত। সেটা তিনি করেননি।’

কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে যে অসাধারণ লেভেলের সেন্স অফ হিউমার তাঁর ছিল,আমরাই তার সাক্ষী রয়ে গেলাম।

কথা বলেছেন কিঞ্জল রায়চৌধুরী

লেখা ৫

মৃণাল সেন সম্পর্কে দুয়েকটি কথা, যা আমি জানি

পুণ্যব্রত পত্রী

১৯৭৬ সাল। মুক্তি পেয়েছে মৃণাল সেনের ছবি 'মৃগয়া' । বন্ধু কবীর আইচের পত্রিকা 'গাছগাছালি' -র অনুরোধে (পত্রিকার এরকম 'অপছন্দের' নাম হওয়া সত্ত্বেও এবং ঘটনাচক্রে ঐ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে যুক্ত থাকার কারণে) লিখেছিলাম ছবিটির সমালোচনা। সমালোচনা নয়, বলা ভালো লিখেছিলাম উচ্ছ্বাস এবং আবেগে ভরা একটি রচনা। সম্ভবত এটিই আমার চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম লেখা।

ছবিটি দেখে একটা কথাই মনে হয়েছিল যে, a frozen poetry in a cruel backdrop। তার মানে এই নয় যে, ছবিটি সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু ঐ যে বললাম উচ্ছ্বসিত হবার মতো যথেষ্ট উপাদানে সমৃদ্ধ। আর সেই নিয়েই লেখা। এর অনেক আগেই দেখেছিলাম 'ভুবন সোম' । বলতে পারি 'ভুবন সোম' ও ছিল quasi existentialism-এর মোড়কে ঢাকা আদ্যোপান্ত একটি কবিতা।

মৃণাল সেন ছিলেন আক্ষরিক অর্থে একজন ভিন্নধর্মী পরিচালক। মধ্যবিত্ত বাঙালির চেতনাকে নাড়িয়েছিলেন সমূলে। তার জ্বলন্ত উদাহরণ ছড়িয়ে আছে একাধিক ছবিতে। কিন্তু যখনই তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালির মনের গভীরে ঢুকেছেন, তাদের ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসকে আঘাত করেছেন, তখনই বাঙালি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাঁর থেকে। যেমন 'একদিন প্রতিদিন' । সময়ের প্রেক্ষিতে এ ছবি নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক। এই ছবি আপামর বাঙালির অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল সেই সময়। আর সেটাই হয়ে

দাঁড়িয়েছিল বাঙালি মানসিকতার অন্তরায়। আবার যখন তিনি সমসাময়িক কলকাতার জনজীবনকে তুলে ধরেন তাঁর ক্যালকাটা ট্রিলজি-র (ক্যালকাটা ৭১, পদাতিক, ইন্টারভিউ) মধ্য দিয়ে, তখন মনে হয়, কলকাতার দিগন্তরেখায় যেন এক সিলভার লাইনিং খুঁজে পেয়েছেন তিনি। যদিও, রাজনৈতিক মতবাদের এই সমস্ত ছবিতে কোথাও একথাও মনে হয়েছে যে, খুব সচেতনভাবেই তিনি যেন একজন পলিটিক্যাল গুরু-র ভূমিকায় অবতীর্ণ। অন্যদিকে 'কোরাস' -এর মতো ছবিতে তিনি এক্কেবারে অন্য মেজাজে হাজির। বলতে দ্বিধা নেই, এখানে তাঁর ছবিতে দেখতে পাই জাঁ লুক গোদারের প্রত্যক্ষ প্রভাব। আবার যদি দেখি 'খারিজ' -এর মতো ছবি, সেখানে তাঁর উপজীব্য মধ্যবিত্তের মনের আশা। সামগ্রিক অর্থে তাঁর প্রায় সমস্ত ছবিই অপটিমিস্টিক। নিরাশা বা হতাশার কোনো স্থান নেই তাঁর ছবিতে।

এরকম এক বহুধা বিস্তৃত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয়েছে বার তিনেক। প্রথমবার আমার বাবা (পূর্ণেন্দু পত্রী)-র তৃতীয় ছবি 'ছেঁড়া তমসুক' -এর প্রিমিয়ারে। দ্বিতীয়বার এক পরিচিতের সঙ্গে তাঁর একটি ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে। আর শেষবার নন্দনে, বাবার মৃত্যুর পর তাঁর শোকসভায়, যেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন একজন বক্তা হিসেবে।

বলেছি প্রথমবার ওঁকে দেখি 'ছেঁড়া তমসুখ' -এর প্রিমিয়ারে। প্রিমিয়ার হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার পূর্ণ সিনেমা হলে। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। নানা দিকপালের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৃণাল সেন। শুধু মনে আছে ছবি শেষে সমস্ত অভ্যাগতদের বলছিলেন, 'আজ প্রমাণিত হয়ে গেল যে পূর্ণেন্দু একজন বড় মাপের পরিচালক।' কথাটা আরো জোরের সঙ্গে বলেছিলেন আমার মাকে, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পর, 'আজ আপনার গর্ব করার দিন, দেখলেন তো, কতবড়ো একজন পরিচালকের স্ত্রী আপনি।'

দ্বিতীয়বার গেছিলাম এক পরিচিতের সঙ্গে, দক্ষিণ কলকাতায় ওঁর বাড়িতে, একটা ইন্টারভিউ নিতে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি শর্ত দিয়েছিলেন যে, এক) আমার পরিচয় গোপন রাখতে হবে, অর্থাৎ বলা যাবে না আমি কার ছেলে। দুই) কোনো প্রশ্ন করা যাবে না, বিশেষত বাবার সিনেমার রেফারেন্স দিয়ে। কথাগুলো আমাকে জানানো হয়েছিল

এক্কেবারে তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে, যখন আমার ব্যাক আউট করার আর কোনো সুযোগ ছিল না। মনের ভেতর অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল জমা ছিল, ভেবেছিলাম জিজ্ঞেস করব সাক্ষাতে, কিন্তু মাঠে মারা গেছিল সব। জরদগবের মতো বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। তবে কোনো প্রশ্ন না করলেও, নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়েছিলাম ওঁর জ্ঞানের বিস্তারে। উনি প্রায় দেড়-দুঘন্টা, কি তারও বেশি সময় ধরে আলোচনা করেছিলেন নানান বিষয়ে নিয়ে। আর মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে শুনেছিলাম তাঁর কথা। আলোচনা করেছিলেন কবিতার সঙ্গে, সাহিত্যের সঙ্গে, শিল্পের সঙ্গে কিম্বা সংগীতের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক নিয়ে। আলোচনা করেছিলেন চলচ্চিত্রে সমাজ বা রাজনীতির প্রভাব নিয়ে। বিদেশি ছবি নিয়ে ও আমাদের দেশের ছবিতে বিদেশি ছবির প্রভাব নিয়েও। সাক্ষাৎকার শেষে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ কোনো কথা ছিল না মুখে, বিমূঢ় হয়ে গেছিলাম। অনেক পরে যখন সম্বিৎ ফিরল, তখন ঐ অর্বাচীনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরকম শর্ত দেওয়ার কারণ কী ? বলা বাহুল্য তার উত্তর সন্তোষজনক ছিল না। যাহোক, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। যেকথা বলছিলাম, অনেক প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল, ইচ্ছে ছিল অনেক কিছু জানার। সে সুযোগ নষ্ট হল।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটোগল্প 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' নিয়ে দুটি ভিন্নধর্মী ছবি, এক) পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্বপ্ন নিয়ে' (১৯৬৫), দুই) মৃণাল সেনের 'খণ্ডহর' (১৯৮৪)। প্রসঙ্গত উল্লখযোগ্য যে 'স্বপ্ন নিয়ে' ছিল বাবার (পূর্ণেন্দু পত্রী) প্রথম সিনেমা। মাত্র এগারো পাতা পরিসরের গল্পটির অনুসরণে। গল্পের মূল চরিত্র বিজন তার দুই সহকর্মী/বন্ধুর সঙ্গে কিছুদিনের ছুটি কাটাতে এসে পৌঁছয় তেলেনাপোতায়। একসময়ের সম্ভ্রান্ত গ্রাম তেলেনাপোতা, জনমানবশূন্য হয়ে গেছিল ম্যালেরিয়ায়। এরকমই একটি গ্রামে এসে উপস্থিত বিজনরা। ম্যালেরিয়া না থাকলেও মশার উৎপাতে অতিষ্ঠ জীবন। বিনিদ্র রজনী, মধ্যরাত। দূরের কোন বাড়ির থেকে ভেসে এল নারীকন্ঠের আর্তরব। পরদিন সকালে বিজন খবর নিয়ে জানতে পারে যে, ঐ আর্তরবটি কমলা নামে এক গৃহবধূর। মূল গল্পে এইটুকু আভাস আছে মাত্র, এর বেশি কিছু নেই।

সিনেমায় রূপান্তরের সময় বাবা কমলা বৌদির চরিত্রটিকে একটি পূর্ণ রূপ দেন। শুধু তা-ই নয়, বিজন ও তার সহকর্মীদের এনে তোলেন কমলা বৌদির বাড়িতে, অতিথি হিসেবে। মৃণাল সেন দাবি করেছেন তিনি 'স্বপ্ন নিয়ে' দেখেননি। তাহলে প্রশ্ন হল, তাঁর 'খণ্ডহর' ছবিতেও কীভাবে কমলা বৌদি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এবং 'স্বপ্ন নিয়ে' -র মতো বিজন ও তার সহকর্মী/বন্ধুরাও ঐ বাড়িরই অতিথি ? মূল গল্প, 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' -এ তো নেই, যা 'স্বপ্ন নিয়ে' -তে আছে। কমলা বৌদির

চরিত্রটি তো এক অর্থে বাবারই সৃষ্টি (এছাড়াও সিনেমার প্রয়োজনে আরো অনেক চরিত্র এবং পরিবেশ বা সিচুয়েশন সৃষ্টি করেছিলেন তিনি)। তাহলে কি ধরে নেব এটা নেহাতই কাকতালীয়। ইচ্ছে ছিল এ বিষয়ে জানার। জানা হল না।

আগেই বলেছি মৃণাল সেনের সঙ্গে আরো একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল নন্দন প্রেক্ষগৃহে, বাবার শোক সভায়। নানান বিষয়ে নিয়ে বাবার সম্পর্কে বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'পূর্ণেন্দুকে বাদ দিয়ে বাংলা শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা অসম্ভব।' বাবার চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন 'মালঞ্চ' প্রসঙ্গ। 'মালঞ্চ' শুরু হয়েছিল ক্রাউড ফান্ডিং দিয়ে। উনি বলেছিলেন 'বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণেন্দু ছিল পথিকৃৎ কিন্তু এভাবেও অর্থ সংগ্রহ করে যে সিনেমা করা যায় তা পূর্ণেন্দুই প্রথম করে দেখাল।'

বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে উনি ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেন এবং শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দক্ষিণ কলকাতা থেকে সল্ট লেকে কীভাবে, কোন পথে এসে পৌঁছবেন জানতে চেয়েছিলেন। এরপর আমি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হয়ে যাই, জানা নেই শেষ পর্যন্ত উনি উপস্থিত হতে পেরেছিলেন কিনা।

লেখা ৬

মৃণাল সেন এবং আমাদের চেনা-অচেনা কলকাতা

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গদ্যময় ক্ষুধার রাজ্যে স্থান নেই কবিতার। সুজলা সুফলা এই বাংলায় মানুষকে বারবার দেশান্তরিত হতে হয় ক্ষুধার তাড়নায়। স্বার্থ লোলুপ কিছু মানুষ বার বার কেড়ে নিয়েছে মুখের গ্রাস। তাই দুর্ভিক্ষকে নিয়ে সাহিত্যিক ন্যাকামো নয়, সজোরে মধ্যবিত্তের পিঠে দিয়েছেন চাবুকের বাড়ি। তাই রোমান্টিক ডিজলভ ছেড়ে জাম্পকাটের কষাঘাত করছেন মধ্যবিত্তের আঁতলামিকে তাঁর সিনেমায়। আর্ট, ফর্ম এসবের বাধা ডিঙিয়ে আসতে বলেছেন চলচ্চিত্র পরিচালকদের। 'পরিচালকদের সামনে সব থকে বড়ো বাধা হল পরিচালক স্বয়ং।' দীর্ঘ কয়েক দশক চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবার পর এই উপলব্ধি মৃণাল সেনের প্রাক জন্মশতবর্ষে (জন্ম : ১৪ মে ১৯২৩,ফরিদপুর, বাংলাদেশ। মৃত্যু : ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮, কলকাতা)।

কলকাতার প্রেমে মজেননি এমন বাঙালি পাওয়া ভার। কবি, সাহিত্যিক, সিনেমা পরিচালক থেকে দিন আনা দিন খাওয়া মনুষগুলো পর্যন্ত। সাহিত্য এবং সিনেমাতে কখনো কখনো পরিপ্রেক্ষিতই একটি চরিত্র হয়ে ওঠে। বিশ্ববরেণ্য সিনেমা পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর ছবিগুলোতে যেভাবে কলকাতাকে দেখিয়েছেন তাতে আমাদের এই প্রিয় শহরটিই যেন একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। রঞ্জু যখন ইন্টারভিউ (১৯৭১) দেওয়ার জন্য স্যুট খুঁজতে যায় তখন কলকাতা ব্যান্ডবক্সের দোকান ঘুরিয়ে হাজির করে তার বড়োলোক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর নাহলেও তার ভাইয়ের স্যুটটা সুন্দর ফিট করে রঞ্জুর (রঞ্জিত মল্লিকের)। গ্রহের ফেরে সেটাও পায় না রঞ্জু, অগত্যা বিরস

বদনে এই শহর তাকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনে।ফেরার পথে বাসে পকেটমারকে ধরা আর থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় লং শটে কলকাতাও ছিল ভিড়ের মাঝে। বাড়ি ফেরার পর উপায় না থাকায় মা আর দিদির পরামর্শে সে সাবেক বাঙালি সাজে মানে ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে চলে যায় ইন্টারভিউ দিতে। বিদেশি কোম্পানির অফিসে যেখানে শেখর কাকুর কথামত সাহেবী কেতাদূরস্ত পোশাকই একমাত্র পরিধেয় সেখানে সে ফুলবাবু সেজে ইন্টারভিউ দিতে ঢোকে। সেই কোম্পানির ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যরা তাদের ভ্রুকুটি এবং আচরনের মধ্য দিয়ে রঞ্জুকে ব্যাঙ্গ করে। দেখুন রঞ্জু যখন বাস থেকে পার্কস্ট্রীটে নামে তখন ক্যামেরায় ধরাপড়া বড়ো বাড়িগুলো কিন্তু অনেক আগেই তাকে রকবাজ পাড়ার বখাটে ছেলেদের মতো টিটকিরি মেরে ছিল। আর আমাদের কলকাতা তখন দাঁত বার করে হাসছিল।ইন্টারভিউতে ব্যার্থ হয়ে সে যখন অবচেতনে স্যুটের দোকানে সাজিয়ে রাখা পুতুলের ওপর আক্রোশে পাথর ছুঁড়ছিল তার পিছনে কলকাতার ইন্ধন অবশ্যি ছিল।কলকাতার চরিত্রটি দেখার মতো ব্যান্ডবক্সের দোকানের কর্মচারীরা ধর্মঘট করলে সে নিশ্চুপ কিন্তু স্যুটের দোকান ভাঙচুরে তার সমর্থন। আসলে এটা হল ব্রিটিশ ঔপনিবেশকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যা বাঙালি মনে থেকে গেছে। হতাশ রঞ্জুর আক্ষেপ নয় এ হল কলকাতার প্রশ্ন, তার সুধী নাগরিকদের কাছ্ যে, ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে কবে বেরিয়ে আসবে ? পোশাকের থেকে যোগ্যতাকে কবে বেশি দাম দেবে ?

এবার আসি কলকাতা-৭১এ (১৯৭২)। না,আমরা আপনাকে টাইম মেশিনে চাপিয়ে ১৯৭১ সালের কলকাতার পথে নিয়ে যাব না,তবে যদি একটু মানস ভ্রমণ হয় ক্ষতি কি? আর পথ প্রদর্শক যখন স্বয়ং কলকাতা। মৃণাল সেন চারটি ছোটো গল্প নিয়ে এই সিনেমাটিকে সাজিয়ে ছিলেন। এখানেও কিন্তু সব কটা গল্পেরই মূল চরিত্র কলকাতা।এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার বৃষ্টির রাতে তাদের বস্তির ঘরে থাকতে না পেরে আশ্রয় নিতে বেরিয়ে পড়ে কলকাতারই এক পাকা বাড়ির ছাদের তলায়।বৃষ্টিভেজা কলকাতা রোমান্টিক নয়, ক্রূর হয়ে ওঠে ঐ বস্তির বাসিন্দাদের কাছে।আবার সেইই পরম মমতায় আশ্রয় দেয় সেই সুখী(?)পরিবারটিকে , তার পাকা ছাদের তলায়।না তার হৃদয় থেকে মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়নি।আসি পরবর্তী গল্পে দিল্লি প্রবাসী তুতো ভাই নলিনাক্ষের চোখে ধরা পড়ে যায় তার পিসির পরিবারের হতশ্রী চেহারা।উদ্বাস্তু গেরস্ত পরিবারকে কলকাতাই হাত ধরে হাফগেরস্ত করে তুলেছিল।তবে আমাদের কলকাতার প্রাণে দয়া আছে,হারু পাঁউরুটি চুরি করে ধরা পড়লেও হারুকে সামান্য রগড়ে দিয়ে দোকানদার খুড়ি কলকাতা কাজ থেকে বরখাস্ত করে,একদম প্রাণে মারে না।যাইহোক,

গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদেরকে তার মা পতিতাবৃত্তিতে উৎসাহিত করে। এখানেও সেই কলকাতাই তার মাকে পথ দেখায়।

চলে আসি পদাতিকে (১৯৭৩)। সুমিত (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়) পুলিসের ভ্যান থেকে পালিয়ে এখানে ওখানে শেল্টার নিতে থাকে। তার বাবা প্রাক্তন স্বদেশী যিনি ব্রিটিশ আমলে জেল খেটেছেন, বাম রজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁকেও দশটা পাঁচটার ভীরু বাঙালি কেরানিতে পরিণত করেছে কলকাতা।তাই দেখি প্রথম বাসে ভিড় ঠেলে উঠতে না পারার জন্য আমদের কলকাতা সহানুভূতির সঙ্গে তাকে পরের বাসের ফুটবোর্ডে তুলে দেয়।রঞ্জু স্যুট না পেলেও বিমান কিন্তু সুমিতের জন্য বেলবটম প্যান্ট আর ডগ কলার জামা নিয়ে আসে। কারণ, কলকাতা তাকে নিয়ে যাবে শহরের প্রলেতারিয়ত বাড়ির বাইরের ঘর থেকে অ্যারিস্ট্রোকেট পরিবারের ডিভানে।আসলে রঞ্জুর চাকরিতে কলকাতার মত ছিল না। সে তার স্বাধীন সত্তাকে অর্থের কাছে বেচে দিক এটা কলকাতা চায়নি।কলকাতা চেয়েছিল বিপ্লবের দীপশিখা বেঁচে থাক -- তাই সে সুমিতকে নিরাপদ শেল্টারে মিস মিত্রের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল সঙ্গে বিমান অবশ্যই ছিল।পাঞ্জাবের মেয়ে,বাঙালি সিঙ্গেল মাদার মিস মিত্র,যিনি একা ছেলেকে মানুষ করছেন আর ছোটো ভাইয়ের কথা মনে রেখে প্রতিবাদীদের সহযোগিতা করে চলেছেন নীরবে। এরাই ছিলেন বিপ্লবের প্রাণশক্তি।এই ভালোবাসা,এই গোপনীয়তা,এই ভরসা দেওয়ার কাজটি কলকাতা তাকে হাতে ধরে শিখিয়েছিল।সুমিত দলীয় নেতৃত্বকে প্রশ্ন করেছিল জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতির ভবিষ্যত নিয়ে? নেতৃত্বের বিরোধিতা করায় সুমিত যখন একাকী, দলের বিরোধিতা করায় দলীয় নেতার বিশ্বস্ত একনিষ্ট কর্মী বিমান সুমিতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে,নেতৃত্বের নির্দেশেই।আবার সেই বিমান সুমিতের মায়ের মৃত্যুশয্যায় সুমিতকে দেখতে চাওয়ার শেষ ইচ্ছা পূরণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়।নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নেতৃত্বের অবাধ্য হয়ে সুমিতকে খবর পৌঁছে দেয়।এখানেই কলকাতা তুলে ধরে তার আসল চরিত্র। সমস্ত রাজনৈতিক আদর্শের ওপরে মানবাতার জয় গান গেয়ে ওঠে সে। মাকে শেষ দেখার পর বাড়ির থেকে বেরোবার আগে সে বাবাকে বিদায় জানায়, আর এই সময়েই পাওয়া যায় গাড়ির আওয়াজ সেটা পুলিশের নাকি মিসেসে মিত্রের?

আশা রাখি কলকাতা তার বিপ্লবী পুত্রকে নিরাপদ আশ্রয় দেবে। মহাপৃথিবীতে (১৯৯১)বার্লিন প্রাচীর ভেঙে যাওয়া,পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজম বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমদের এখানে কিছু হয় না।দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে মানুষের মনের প্রাচীর কেন ভাঙে না এ প্রশ্ন কলকাতা আমাদের করে। আমরা নির্বাক।

মৃণাল সেন তাঁর ছবিগুলোতে কলকাতার বাড়িঘর, উঠোন, যানবাহন, পথঘাট, বাজার, দোকানকে এমন ভাবে ধরেছেন যাতে কলকাতা আমাদের কাছে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।মন্তাজ,জাম্পকাট,লঙ এবং শর্ট শটের ব্যবহার কলকাতা চরিত্রতে প্রাণের সঞ্চার করেছে।অবশেষে আসি সেই কুড়ি বছর বয়সী ছেলেটির কথায়।কলকাতা জানত কে তাকে মেরেছে? এত মৃত্যু,এত অনাচার,এত অপরাধ আমরা কী করে সহ্য করছি এ প্রশ্ন কলকাতা আমাদের করেছিল , এর উত্তর দেওয়ার দায় আপনার আমার।কলকাতা তার এঁদো ছোট্ট পশ্চিমের গলির ভেতর ২০ বছরের তরতাজা যুবকের রক্তস্নাত দেহকে পরম মমতায় বুকে জাপ্টে নিয়েছিল। নিয়নআলো,বাস,ট্রাম গাড়িঘোড়ার আওয়াজ থেকে একটু দূরে পশ্চিমের গলিতে যাবেন নাকি কলকাতার সঙ্গেএকবার দেখা করতে !

ঋণস্বীকার : উইকিপিডিয়া
কনভারসেশন – মৃণাল সেন, রাজীব মেহরোত্রা

লেখা ৭

বাঙালির আত্মমর্যাদা ও সাফল্যের প্রতীক পদ্মা সেতু

তরুণ চক্রবর্তী

শুধু একটি সেতু নয় পদ্মা সেতু। অনেক কিছু। বাঙালির অহংকার। পদ্মার প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে, খরস্রোতকে শাসন করে, অনেক জল্পনা-কল্পনা এবং সমালোচনার মুখ বন্ধ করে, তলাবিহীন ঝুড়ির সাফল্যের এক প্রতীক হিসাবে আগামী দিনে চর্চিত হবে পদ্মা সেতু। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে খুন করে দেশের স্বাধীনতাকে যারা লুন্ঠন করতে চেয়েছিল তাঁদের সেই ষরযন্ত্রের বিরুদ্ধে, রাজাকার ও নব্য রাজাকার, জেএমবি ও নব্য জেএমবি, পাকিস্তানের দালাল ও তাঁদের উত্তরসূরীদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশনেত্রী শেখ হাসিনার নোক্ষম জবাব এই পদ্মা সেতু। শুধু বাংলাদেশেরই নয়, গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোটি কোটি বাঙালির গর্বের ইমারত হয়ে থাকবে এই সেতু। আর এটা বুঝতে পেরেই স্বাধীনতা বিরোধীদের দোসররাও এখন পদ্মা সেতু নির্মাণে নিজেদের কৃতীত্ব জাহিরের বৃথা চেষ্টা করছেন।

পদ্মা সেতু আসলে একটি আন্দোলনের নাম হয়ে উঠেছে। বহু ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে শেখ হাসিনার অদম্য ইচ্ছা শক্তির কাছে সমস্ত প্রতিকূলতা পরাস্ত হয়েছে। ড কিলোমিটার ১৫০ মিটার দৈর্ঘের এই সেতু নির্মাণে প্রথম থেকেই বাধা আসে। সেই

বাধা হেলায় অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। দুর্নীতির অভিযোগে অর্থায়ণে বিশ্বব্যাঙ্ক সম্মত না হলেও বাংলাদেশ নিজেই ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা খরচ করে এই সেতু নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থ দপ্তর থেকে বার্ষিক ১ শতাংশ সুদে সরকারি সেতু নির্মাণ বিভাগ এই কাজের বরাত পেয়েছিল। চীনা চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানি এই সেতুটি নির্মাণ করেছে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় শুধু মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের সাথে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা যুক্ত হয়নি, দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন বাংলাদেশের অআগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

স্টিল ও কংক্রিটের দোতলা সেতু নির্মাণে কম ধকল সহ্য করতে হয়নি। অর্থায়ন নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন তুলেছিল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। তারপরও সেতু নির্মাণ রোখা যায়নি। চার লেনের সড়ক পথ এবং রেলপথ রদ্মা সেতুর স্বপ্নকে আজ বাস্তবে রূপান্তরিত করেছে। ১৮.১০ মিটার চওড়া এটিই দেশের বৃহত্তম সেতু। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে আজ উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের মতোই পদ্মা সেতু লেখা থাকবে সাফল্যের নজির হিসাবে। প্রথমত, বিশাল পরিমান অর্থায়ন মোটেই সহজসাধ্য ছিলোনা। এরজন্য প্রয়োজন ছিল সঠিক লক্ষ্যে সঠিক পরিকল্পনার। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশকে সঠিক দিশা দিতে সক্ষম হয়েছেন হাসিনা। পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রেও দুর্নীতির বদনাম ঘুচিয়ে কড়া হাতে বাঙালির স্বপ্নকে স্বার্থক করেছেন তিনি। সেইসঙ্গে পদ্মাকে শাসন করাও মোটেই সহজ ছিল না। পিলার বসানোর সময় সেটা ভালো করেই টের পেয়েছেন দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীরা। কিন্তু শেষমেষ পাকিস্তানের খান সেনার মতোই প্রতিকূলতাকে পরাস্ত করেই শেষ হাসি হেসেছে বাংলাদেশ।

৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত আর তিন লাখেরও বেশি বীরঙ্গনার ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতাকে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে লুন্ঠন করতে চেয়েছিল রাজাকারের দল। প্রাথমিক ভাবে তাঁরা কিছুটা সফল হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর দেশ অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের পরই নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার শপথ নেন জননেত্রী হাসিনা। কিন্তু পদে পদে বাধা আসে। তাঁকেও হত্যার চেষ্টা করে পাকিস্তানের দালালরা। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে বাংলাদেশকে দূর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন মুজিব-কন্যা। হেনরি কিসিঞ্জারের সেই তলবাবাহিনী ঝুড়ি আজ গোটা দুনিয়ার সমাদৃত অর্থনীতি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্ত মানদন্ডেই পাকিস্তানকে পিছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে জাতিসংঘের বিচারে উন্নয়নশীল দেশটি। এমনকী, বিভিন্ন মানব

সূচকে ভারতকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশ। উন্নয়নশীল দেশেই আত্মতৃপ্ত থাকতে চাননা প্রধানমন্ত্রী। তাই তিনি বাংলাদেশকে সর্বক্ষেত্রে উন্নত দেশ হিসাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। সোনার বাংলার স্বপ্নে বিভোর শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব বাংলাদেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে টেনে তুলেছেন। এই উন্নয়নের গতিরোধ করার ক্ষমতা কারও নেই।

জাতিসংঘের নির্ধারিত যাবতীয় শর্ত পূরণ করেই বাংলাদেশ আদায় করে নিয়েছে উন্নয়নশীল দেশের তকমা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তাঁদের এই প্রাপ্তী অবশ্যই গর্বের। উন্নয়নশীল দেশের তকমা পেতে গেলে প্রথম শর্তই হচ্ছে মাথাপিছু গড় আয় হতে হবে কম করে ১ হাজার ২৩০ ডলার। ২০২০ সালে বাংলাদেশের গড় আয় ছিল ২ হাজডার ৬৪ ডলার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে গড় আয় ২ হাজার ৮১৪ মার্কিন ডলার। অর্থাত কোভিড পরিস্থিতিতেও গড় আয়ের উর্ধগতিতে লাগাম পড়েনি। জাতিসংঘের নির্ধারিত অর্থনৈতিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের মানদন্ড ৩২-এর নীচে থাকা জরুরি। বাংলাদেশের সূচক ২৫.২। মানব সূচক থাকা উচিত ৬৬-র ওপরে। বাংলাদেশ রয়েছে ৭৩.২। অর্থাত তিনটি সূচকেই বাংলাদেশ উন্নিত হয়ে তবে আদায় করে নিয়েছে উন্নয়নশীল দেশের শিরোপা। কিন্তু এতেই থেমে থাকতে চায়না বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা।

শেক হাসিনার উন্নয়ন কর্মসূচির মূলমন্ত্রই হচ্ছে জাতির পিতার দেখানো পথ। তিনি নিজেই বারবার বলেছেন, 'বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন। বাংলার মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। জাতির পিতা বেঁচে থাকলে ১০ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হত। আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।' শুধুমাত্র কথার কথাই নয়, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদা দিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ একটি রুপরেখাও তৈরি করেছে। সেই রুপরেখা অনুযায়ী বলা হয়েছে, বছরে প্রতিটি উপজেলা থেকে ১ হাজার বেকার যুবকের চাকরি নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশে দারিদ্রের হার

বর্তমানে ২০ শতাংশের বেশি রয়েছে বলে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার জরিপে প্রকাশ। হাসিনা চাইছেন দারিদ্রতাকে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনতে। মোট দেশজ উতপাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি রয়েছে মানুষেরক গড় আয়ু বাড়িয়ে ৮৩ বছর করার লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ আরও দ্রুত গতিতে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। তবে দেশের সার্বভৌমত্ব বা নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে উন্নয়নে রাজি নন হাসিনা। তাই শ্রীলঙ্কার মতো পরনির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের যোগ্যতা ও ক্ষমতাতেই পদ্মাসেতু গড়ে তুলে আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের উতকৃষ্ট নজির তৈরি করলেন হাসিনা। মোট দেশজ উতপাদন বা জিডিপি ঠিক রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন মানবিক সূচকেও বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে।

মানব সূচকে বাংলাদেশ ভারতকেও টেক্কা দিচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ১৫৩ জন। ২০১৮ সালে এসে সেটি ২২ জনে নেমে আসে। ২০৩০ সালে এই হার ১২ করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। ১৯৯১ সালে মাতৃ মৃত্যুর হার ছিলে ৪.৭৮ শতাংশ। এখন ১.৬৯ শতাংশে নেমে এসেছে। বাড়েছে মানুষের গড় আয়ু। ২০১৮ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৭২.৩ বছর। ২০১৯ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ৭২.৬ বছর। ২০২০ সালের জরিপে উঠে এসেছে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন ৭২.৯ বছর। নারীদের গড় আয়ু আরও বেশি। বাংলাদেশের নারীরা গড়ে বাঁচেন ৭৪ দশমিক ৫ বছর। নারীর কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির পাশাপাশি কমেছে অপুষ্টি ও ক্ষুধার সূচকও। সবমিলিয়ে ভালো আছে বাংলাদেশ।

সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ভর করে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের মহাসূচক হিসাবে পদ্মাসেতু বাঙালির অহংকার।

লেখা ৮

বিপন্নতা বাড়ছে মধ্যবিত্তের

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

পরিস্থিতি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে মধ্যবিত্তের কাছে। করোনার দ্বিতীয় দফার আক্রমণের পর সাধারণ মধ্যবিত্তের অবস্থা আরও বেহাল হয়েছে । পিউ রিসার্চ জানাচ্ছে, ২০১৯ এর তুলনায় ২০২১ এ ভারতে মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে। অর্থাৎ ৩ কোটি ২০ লাখো মানুষ মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র হয়ে গেছে গেছে। এই সমীক্ষা করার সময় অবশ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তিনটি স্তরে ভাগ করে নেওয়া হয়। সমস্যায় পড়েছে নিম্ন এবং মধ্যশ্রেণির সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। রাষ্ট্রসংঘ ও বিশ্বব্যাংকের হিসেবে, দৈনিক দশ থেকে কুড়ি ডলার আয় নিম্নমধ্যবিত্তের এবং উচ্চ মধ্যবিত্তের আয় দৈনিক কুড়ি থেকে ত্রিশ মার্কিন ডলার। এই হিসেবে তারা দেখতে পাচ্ছে, ২০২১ এর জুন মাসে ভারতীয় নিম্ন ও সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের এক-তৃতীয়াংশের আয় কমে গেছে। আয় কমে যাওয়ার কারণ কাজ হারানো এবং এই করোনা আক্রান্ত অর্থনীতিতে সরকারি কোনো সুবিধা না পাওয়া। সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই করোনা আক্রমণে সেন্টার ফর মনিটরিং

ইন্ডিয়ান ইকনমি (সি এম আই ই) এর তথ্য অনুযায়ী গত বছর থেকে এখনো পর্যন্ত ১ কোটি বেতনভুক মধ্যবিত্তের চাকরি গেছে। ২৬মে ২০২১ পর্যন্ত বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ১১.১৭ শতাংশ,এর আগে সেটাই ছিল ১৪.৭৩%। চলতি বছরে দেশজুড়ে একসঙ্গে লক ডাউন না হওয়ায় বেকারত্ব সামান্য হয়ত কমেছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের বিপন্নতা কমেনি।

ঠিক এই যখন বাস্তব পরিস্থিতি তখন রিজার্ভ ব্যাংক জানাচ্ছে, হু হু করে কমেছে দেশের মানুষের পারিবারিক সঞ্চয় (household savings)।২০২০ সালের জুন মাসে যেটা ছিল ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২১.৪ শতাংশ, সেটাই করোনার কারণে টানা মাসের পর মাস লক ডাউনে কমে দাঁড়িয়েছিল ৮.৪ শতাংশে।উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সঞ্চয়ের প্রকৃত পরিমাণ কমেছিল এক তৃতীয়াংশের বেশি, কারণ যে ৮.৪% দেখানো হচ্ছে, সেটাও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে যা কমে গেছে ক্রমশ প্রতিমাসে মাসে, সেই অংকের ভিত্তিতে।তাই তার ৮.৪% অর্থাৎ প্রকৃত পরিমাণ হতে পারে আগের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে খুব বেশি হলে ৬ %। এরপর ২০২১ সালে এপ্রিল ত্রৈমাসিক শেষে সাধারণের সঞ্চয়ের অবস্থা আরো করুণ হয়েছে। আরো কমে জি ডিপি র ৫.৪ % হয়েছে সঞ্চয়ের পরিমাণ। প্রকৃত অর্থে জিডিপির পুরোনো হিসেবে ধরলে কমে এটা হয় ৩.৫% ।তাহলে বোঝা যাচ্ছে জনগণের সঞ্চয় কমে তলানিতে এসে ঠেকেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য তাইই বলে।

এদিকে সরকারও যে মরিয়া হয়ে গেছে বোঝাই যাচ্ছে। গ্যাসের দাম হাজার টাকার বেশি করেও সামাল দিতে পারছে না রাজকোষের ঘাটতি।এর জন্য রাশিয়ার যুদ্ধ কিংবা বিদেশে তেলের দাম বৃদ্ধি যে আসল কারণ নয় সেটাও মানুষকে বোঝাতে পারছে না। জিনিসের দাম করোনার পরে বাড়বে, এটা জানাই ছিল। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ৮% ছুঁয়ে ফেলবে, এতটা অভাবনীয়। অবস্থা এমন যে রাজকোষের ঘাটতি মেটাতে সরকারি সংস্থার শেয়ার সম্পদ কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। এর পর এই সরকারকে কি দেউলিয়া বলা উচিত নয়? নাকি বলা উচিৎ দেউলিয়া হওয়ার জন্য অপেক্ষারত এক দিশেহারা সরকার যার অর্থনীতিতে কোনো দিশা নেই।

দামবৃদ্ধি ও রাজস্ব ঘাটতি বৃদ্ধির এই চক্র বহুদিন ধরেই চলছে। দিনের-পর-দিন সরকার এমন পরিস্থিতিতে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার সম্মিলিত ফল এই মুহূর্ত অর্থনীতির গোত্তা খেয়ে পড়া। তাই না চাইলেও গুনাগার দিতে হচ্ছে দেশের মানুষকে। শুরু হয়েছে নোটবন্দি থেকে । সেই ধাক্কায় দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাহীনতা যেভাবে

সর্বস্তরে লেনদেন কমিয়ে দেয়,তারই প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদন ও পরিষেবা সংকুচিত হয়ে দাম বাড়াতে থাকে। দীর্ঘ আড়াই বছরে এর প্রলম্বিত প্রতিক্রিয়ায় দেশের স্বাস্থ্যবান অর্থনীতিতে রক্তাল্পতা শুরু হয়। অর্থাৎ চাহিদা কমতে থাকে। এই ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে, অবৈজ্ঞানিক হারে চাপিয়ে দেওয়া হল জি এস টি ব্যবস্থা। এতে যে জিনিসের দাম আরো বাড়বে সেটা তখনই প্রায় প্রত্যেক অর্থনীতিবিদই বলেছিলেন। পাল্টা যুক্তিতে সরকার পক্ষ বলেছিল,কোষাগারের আয় বাড়লে সেটা নাকি অতিরিক্ত কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে লগ্নি হবে আর সেই লগ্নি দিয়ে মানুষের আয় বাড়বে, বর্ধিত দামের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয় বেড়ে সেটাও উন্নয়নের পথ দেখাবে। বাস্তবে সেটা হল না। রাজকোষের টাকা চলে গেল খেসারত দিতে। দেউলিয়া বা পলাতক কর্পোরেট বন্ধুদের অনাদায়ী ঋণের চাপ থেকে ব্যাংকগুলোকে উদ্ধার করতে। একের পর এক হাজার হাজার কোটি টাকার লোন নেওয়ার নাম করে তারা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল । প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ এভাবেই হারাল ভারতবাসী।

সাকুল্যে করোনাকালে প্রভাব পড়েছে বেশি শহুরে মধ্যবিত্তের ওপর। একটা বড়ো অংশের শহুরে যুব এমনিতেই বেকার । দেশের মোট বেকারের সাড়ে ১৪ শতাংশ তারা। সেখানে করোনার কারণে কাজ হারানো শ্রমিক পরিচারক দিনমজুর থেকে শুরু করে বড়ো সম্পন্ন কর্পোরেটে চাকরি করা মধ্যবিত্তের সংকট তীব্রতর। এই সময়ে দেশের কর্মহীন জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ শহুরে মধ্যবিত্ত!! অসংগঠিত ক্ষেত্রের হিসাব এর মধ্যে নেই, সেটা ধরলে আনুমানিক ৪০ শতাংশ । শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে করোনাকালে কর্মহীনতা ও আয় কমে যাওয়া জনিত সংকট তীব্রতর।

আশার কথা এটাই যে, পশ্চিমবঙ্গের মতো কয়েকটি রাজ্যে করোনো পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং বেকারি হ্রাস ও কর্মসংস্থান বাড়াতে১০০ দিনের কাজ এইসময় ভালো

হয়েছে। ফলে এই সব রাজ্যে গ্রামে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা শুরু হয়।এই রিভার্স মাইগ্রেশন সম্ভব হয়েছে গ্রামে অতিiরিক্ত কর্মসংস্থান আর কৃষির বৃদ্ধির ধরে রাখার চেষ্টায়। সি এম আই ই জানাচ্ছে, ৯০ লাখ কর্মসংস্থান হয়েছে গ্রামে এই করোনাকালে। তাই গ্রামে আয় কমে যাওয়ার সমস্যাটা শহরের তুলনায় কম। অন্যদিকে শহরের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মহীনতা এবং আয় কমে যাওয়ার তীব্রতা গ্রামের তুলনায় বেশি।

লেখা ৯

কস্তুরী --- এক অনন্য স্বাদের আকর্ষণ

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

খাওয়াদাওয়া ছাড়া বাঙালির সংস্কৃতি সম্পূর্ণ হয়না। আজকের বাঙালি যতই ‘ বং’ হয়ে যাক, রসনাতৃপ্তির ক্ষেত্রে তারা কিন্তু আগেকার মতোই আপোসহীন। বর্তমান সময়ের যান্ত্রিক ব্যস্ততায় হেঁশেল থেকে যতই বাটা মশলা বিদায় নিক না কেন, যদি কেউ সেই স্বাদের রান্নার অকৃত্রিম আবেদন এনে দিতে পারে তাহলে বাঙালি সেই জাদুতে বশ হবেই হবে। তাই বলে বাইরের খাবার ? এই প্রশ্নচিহ্ন যদি মনের কোণায় উঁকি দিয়েও যায়, তবুও বাঙালি সেই ঘরোয়া স্বাদের রান্নার খোঁজ চালাতে বিরামহীন। আর সেই খোঁজ চালাতে গিয়েই জানা গেল –কলকাতার আনাচেকানাচে এমন কয়েকটি রেস্তোরাঁ রয়েছে , বাঙালির হেঁশেলের আসল স্বাদ পরিবেশনে যাদের জুড়ি নেই। তেমন রেস্তোরাঁর তালিকায় প্রথমসারিতেই উঠতে বাধ্য ‘কস্তুরী’ র নাম – যাদের রান্নায় ওপার এপার দুই বাংলা মিলে মিশে একাকার। স্বাভাবিক, কারণ রান্নার বৈচিত্র্যেই শুধু নয়, ‘কস্তুরী’ কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই বাংলার সংস্কৃতিকে স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে ধারণ করে চলেছে। কীভাবে ? তারই অনুসন্ধানে ঢুকে পড়া গেল ১১এ , হিন্দুস্তান রোড-এ কস্তুরী (Kasturi) রেস্তোরাঁয়।

দরজা ঠেলে ভেতরে পা রাখতেই মনে হল চলমান শহর থেকে এক টুকরো কলকাতাকে আলাদা করে এই ফ্লোরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে , যেখানে কথা বলে উঠছে বিগত সময়। ডানদিকের বিস্তৃত দেয়াল জুড়ে একদিকে রবীন্দ্রনাথ, উত্তম-সুচিত্রা,অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের ছবি। কানে আসছে

স্বর্ণযুগের বাংলা গান। চেয়ার টেনে বসতেই সম্ভাষণ জানাচ্ছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কতকাল দেখিনি তোমায়, বড় সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি!’ স্মৃতি, হ্যাঁ স্মৃতি-সম্পদের প্রতিচ্ছবিই নিজের অবয়বে মেলে ধরেছে এই রেস্তোরাঁ। চোখে পড়ছে টেবিলে সাজানো কাঁসার গেলাস। খাবারও পরিবেশন করা হয় কাঁসার থালাতেই। শঙ্খ-হাতপাখা-কুলো-ঢাক-কলকাতা-ফুটবল-ট্যাক্সি-মাছ-মিষ্টির বিচিত্র কেমিস্ট্রি রয়েছে এই রেস্তোরাঁর পরিবেশে ও সাজসজ্জায়। বাঙালির হাড়ে-মজ্জায় মিশে থাকা রসনা-সংস্কৃতির আশ্চর্য মিশেল রয়েছে এর প্রতিটি কোণায়। এতটুকুও কৃত্রিম মনে হয় না। পুরোনো ক্যান্টিন বা কেবিনের ধাঁচে গদিআঁটা কেঠো চেয়ারে পাঁচ মিনিট বসে টেবিলের ওপর ঝুলন্ত মিহি আলোর দিকে তাকালে মনে হবেই --বিগত শতকের ছয় বা সাতের দশকের রিয়্যাল এসেন্স টের পাচ্ছেন। এসি রয়েছে, মৃদু। আরাম হবে, ক্লান্তি দূর, অথচ মনেই হবে না শীতাতপের যন্ত্রচালিত নিয়ন্ত্রণ কামরাটিকে কৃত্রিম শীতলতা দিচ্ছে। মিষ্টি লস্যি বা আম পান্নার সরবতে চুমুক দিয়ে আপনি হয়তো মেনুকার্ডে চোখ বোলাচ্ছেন। ভাবছেন কী অর্ডার দেবেন? ঠিক তখনই ডানপাশের দেয়ালে আঁকা হাওড়া ব্রিজের কোলাজ আপনাকে হাতছানি দেবে। ট্রাম-ট্যাক্সি, চিংড়ি-ইলিশ, ধুনুচি-গিটারের সমাহারে 'এপার ওপার মিলেমিশে একাকার।' হ্যাঁ, এটাই কস্তুরীর ট্যাগলাইন। কস্তুরী ঐতিহ্যে অভিজাত। বাংলাদেশে তো আছেই, খাস কলকাতাতেও অনেকগুলি শাখা রয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় গড়িয়াহাটের হিন্দুস্তান রোডের এই শাখাটি অবশ্য ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত।প্রশ্ন করেছিলাম, কস্তুরী তাহলে কি বাংলাদেশের শাখা সংস্করণ? উত্তরে রেস্তোরাঁর কর্মচারী মিলন জানালেন, ‘না , ঠিক তা নয়। কস্তুরী হল ওপার বাংলা-এপার বাংলার সম্মিলিত রূপ।’

কানে বাজছেন অনুপ ঘোষাল , ‘তোমারে চাওয়ার পালা···। ’ সেই সময় মেনুকার্ডে আপনাকে হয়তো টানছে 'পাবদা বড়ি বেগুন ঝোল' বা 'ভেটকি পাতুরি', ওদিকে আপনার সঙ্গিনীর পছন্দ 'ইলিশ পোস্ত' বা 'সর্ষে পমফ্রেট'। সেই মূহর্তের জন্য ছোট্ট টেবিল যেন হয়ে উঠবেই ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ফুটবল গ্রাউন্ডের মিনিয়েচার লাইভ! মজার ব্যাপার হল --গোটা ব্যাপারটার মূল উদ্দেশ্যই কিন্তু নানাস্বাদের খাওয়াদাওয়া, অথচ রসনা তৃপ্ত করতে গিয়ে আপনার

অজান্তেই আপনাকে মিলিয়ে দেওয়া দুই বাংলার কৃষ্টির সঙ্গে। আর কস্তুরী ঠিক সেটাই করে।

আপনি এবং আপনার সঙ্গিনী এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা মেইন ডিশের রফা করে ফেলুন। তাতে না হয় ম্যাচটা ড্র-ই হল! সরু বাসমতি চালের ভাত, সোনামুগের ডাল অথবা ঢাকাই ডাল ফ্রাই। এবার আরোকিছুর খোঁজে চোখ পড়বেই 'লোটে শিলে বাটা'-য়। এই প্রিপারেশনটা কিন্তু এই রেস্তোরাঁর স্পেশ্যালিটির মধ্যে একটি। অতএব চটপট ওয়েটারকে ডাকুন।

খাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে এই রেস্তোরাঁর অঙ্গসজ্জা ও পরিবেশ আপনাকে প্রতি মূহুর্তে খাঁটি বাঙালিয়ানা অনুভব করতে সাহায্য করবে। খেতে খেতে আপনি চোখ বোলাবেন চিত্র-বিচিত্র দেয়ালের বিনির্মিত চিত্রনাট্যে, সেখানে খুঁজে পাবেন অক্ষরমালায় সাজানো বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি-খেলাধুলো-সিনেমার বর্ণনা। সময়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঠিক যেভাবে ওপারবাংলা-এপার বাংলা মিলেমিশে গিয়েছে, যেভাবে ঘটেছে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সংমিশ্রণ -- এই রেস্তোরাঁর দেয়াল পটে ঠিক তাই ফুটে উঠেছে নেপথ্যের আক্ষরিক ভাষায়। প্রেসিডেন্সি, প্রিন্সেপ ঘাট, ইলিশ,চিংড়ি,কলেজ স্ট্রিট, ইডেন গার্ডেন , মিষ্টি দই, ফেলুদা, বাংলা ব্যান্ড, গুপীবাঘা, টানা রিক্সা, ধর্মঘট, দাদাগিরি, রবীন্দ্রসদন, hoichoi, --লেখাগুলি চোখে পড়লে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে স্ক্যাটার্ড, কিন্তু তা একেবারেই নয়। আসলে এগুলি হল ব্যাখ্যাহীন স্বতঃস্ফূর্ত নিরুষ্কার বর্ণমালার গাঁথামালা। মালা হলে ফুলগুলিকে যেমন আলাদা বলা যায় না, এও যেন ঠিক তা-ই । এই শব্দসমাহারে মালা গেঁথেছে বাঙালি সংস্কৃতির তখন এবং এখন।

"শুরু থেকে শেষ পাত, দুই বাংলার সেরা স্বাদ" । এই স্বাদ কতটা সাধ্যের মধ্যে সেপ্রশ্ন মনে জাগতেই পারে। অনেকের মতে এই রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া বেশ খানিকটা খরচসাপেক্ষ। তা একটু মনে হলেই বা ! অকেশনের বিশেষ দিনে বৈচিত্র্যের স্বাদ পেতে বাজেটটা মোটেই অসাধ্য কিছুও নয়। তাছাড়া খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি যে মনোরম

পরিবেশ, তার জন্য কিছুটা বাড়তি খরচ তো আছেই।তবে সন্দেহ নেই, একবার এই রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে, অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরবেন। 'শারদীয়ার ভুরিভোজ, খেতে হলে আসুন রোজ' : বলছে কস্তুরী। এখানে পূর্ব ও পশ্চিম ঘরানার মাছ-মাংস-নিরামিষের বিভিন্ন পদ যেমন রয়েছে, তেমনই শেষপাতে ডেজার্ট হিসেবে 'নির্দিষ্ট দিনের চাটনি' (Chutney of the day), রসমালাই বা ডাবপায়েস রয়েছে। তবে কিছু পদ 'কস্তুরীর স্পেশ্যাল আমিষের' মধ্যে গণ্য। যেমন- 'লোটেশিলেবাটা' কিংবা 'কচুপাতা দিয়ে চিংড়িভাপা' । দ্বিতীয় পদটি বিশেষত বাইরের যেকোনো রেস্তরাঁয় দুর্লভ। রইল পদটির প্রিপারেশনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা---

কচুপাতা দিয়ে চিংড়ির ভাপা

চিংড়ি মাছগুলো প্রথমে সেদ্ধ করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। অন্যদিকে কচুশাক কেটে , সেদ্ধ করে জলটা ফেলে দিয়ে আরেকটি পাত্রে রাখা হয়।এরপর কড়ায় সর্ষের তেল, কাঁচা সর্ষের পেস্ট, হলুদ, কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভালো করে সাঁতলাতে হবে। গ্রেভি মাখামাখা হয়ে এলে তাতে সেদ্ধ করা কচুশাক আর চিংড়ি দিয়ে ভালো করে নেড়ে ৮ থেকে ১০মিনিট চাপা দিয়ে রাখতে হবে। প্রিপারেশনটা পুরো তৈরি হয়ে এলে তার মধ্যে নারকেলবাটা দিয়ে দেওয়া হয়। সবশেষে নামানোর আগে ওপর থেকে কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিলেই 'কচুপাতা দিয়ে চিংড়ির ভাপা' রেডি।

লেখা ১০

এবং মহামেডান

প্রসেনজিৎ মজুমদার

এ বছর মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আইলিগে রানার্স আপ হল। আইএফএ শিল্ডের রানার্স, দীর্ঘ চল্লিশ বছরের খরা কাটিয়ে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া মহামেডানের মুকুটে এ এক নতুন পালক বইকি ! রুশ কোচ চেরনিশভ ও অধিনায়ক নিকোলা স্টোইকোভিচের হাত ধরে মহামেডানের এহেন সাফল্য বলেই অনেকে মনে করেন। এছাড়াও ক্যারিবিয়ান মার্কাস জোসেফ সহ দলের সব খেলোয়াড়দের এই কৃতিত্ব প্রাপ্য। মহামেডানের অধিকাংশ বিদেশি রিক্রুটই ভালো। সেই সঙ্গে সাপোর্টিং প্লেয়ার হিসেবে ভারতীয়রাও পিছিয়ে ছিলেন না। এবং কোচ কর্মকর্তাদের চেষ্টার ফলে দলটাকে একই সূত্রে গাঁথা সম্ভব হয়েছিল। তবুও কারোর কারোর মতে গত মরসুমে কলকাতা লিগ জয়ে কিছুটা খাদ থেকেই গ্যাছে। কারণ, অন্য দুই বড়ো ক্লাবের অনুপস্থিতি। জনৈক মহামেডান সমর্থক আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘ তবু এই জয় যে নেহাৎই ফ্লুকে আসেনি আইলিগে সাফল্যই তার প্রমাণ। অনেকদিন পর কেরালা ফুটবলে জোয়ার এসেছে তারা সন্তোষ ট্রফি জিতেছে। পাশাপাশি গোকুলম কেরালা এফসি গত দুবছর ধরেই দুরন্ত ফর্মে। এমনকী এএফসি কাপের প্রথম সুযোগেই প্রথম ম্যাচে মোহনবাগানকে ৪-২ গোলে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল। ফলে তাদের কাছে ২-১ গোলে হারাটা অগৌরবের নয়।’ মহামেডান সমর্থকদের অনেকেই বলছেন মহামেডানের সাফল্যের অন্যতম কারণ হল কর্মকর্তাদের সদিচ্ছা। ইংল্যান্ডের কোম্পানি বাঙ্কারহিলের সঙ্গে প্রথমে ২০শতাংশ ওপরে ৫০শতাংশ শেয়ার বেচে আখেরে ক্লাবের ভোল বদলে দিয়েছেন দীপেন্দু বিশ্বাস ও কামরুদ্দীন আহমেদরা। শোনা যাচ্ছে

আইএসএল খেলতে আগ্রহী মহামেডান। খবরে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এব্যাপারেও কথাবার্তা চলছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও চান মহামেডান আইএসএল খেলুক। একটি ডিজিটাল চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মহামেডান শীর্ষকর্তা কামরুদ্দীন আহমেদ বলেন, 'আমরা একটু অন্যভাবে এগোতে চাইছি। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে দেখে আমাদের খুব শিক্ষা হয়েছে। আমরা ভালো দল গড়ে ফল পেয়েছি' ।'

সম্প্রতি মহামেডান ক্লাবের তাঁবুতে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল ক্লাবতাঁবু ঢেলে সাজানো হচ্ছে। চলছে সংস্কার। বানানো হয়েছে কাফেটেরিয়া। রাজ্যসরকারের অর্থানুকূল্যে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা হয়েছে। গ্যালারির অবস্থা নিঃসন্দেহে আগের থেকে অনেক ভাল। এএফসির লাইসেন্সিং-এর নিয়মকানুন মানার তোড়জোড় চলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তার মতে অবশেষে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব বুঝতে পেরেছে স্রেফ ঐতিহ্য আঁকড়ে থেকে পেছন দিকে হাঁটার দিনশেষ। আধা-পেশাদারি মানসিকতা নিয়ে চললে ভবিষ্যতে ক্লাব তুলে দিতে হবে। গত কয়েক দশকের ব্যর্থতার ফলে দল তখন তলিয়ে গিয়েছিল সর্বভারতীয় বৃত্ত থেকে। আইলিগের সাফল্যই আবার তাকে সর্বভারতীয় আলোচনায় ফিরিয়ে এনেছে। প্রসঙ্গত গত মরসুম থেকেই শোনা যাচ্ছিল মহামেডান নাকি আইএসএল খেলতে চায়। কিন্তু আইএসএল খেলার অন্যতম শর্ত হল পরিকাঠামো তৈরি করা। সেইজন্যই মাঠ সংস্কার করা হয়েছে এক প্রস্থ, যদিও এখনও অনেক কাজ বাকি। তবু বাকি হলেও কর্তারা সদিচ্ছা দেখাতে কসুর করছেন না। জনৈক সমর্থক সিরাজুল ইসলাম এপ্রসঙ্গে বলেন ' শোনা যাচ্ছে মাল্টিজিম বাজাকুজি জিমও নাকি আনার কথা হচ্ছে ক্লাবে। আধুনিক পরিকাঠামোগত সুবিধা না থাকলে ভালো ইনভেস্টার বা ভালো বিদেশি খেলোয়াড়দের আকৃষ্ট করা যাবে না।' প্রচুর গুজবের মধ্যেই এটাও শোনা যাচ্ছে যে, এফএসডিএলের সঙ্গে দফায় দফায় নাকি বৈঠক হয়েছে ক্লাবকর্তাদের। তবে এর সত্যতা যাচাই করিনি আমরা। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর -- মহামেডান ক্লাব নাকি মাল্টি ইনভেস্টার নিয়ে দল গড়তে চায়। ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশ শেয়ার বাঙ্কারহিলের কাছে বিক্রি করেছে। বাকি ২৫ শতাংশ কোনো ক্লাব ঘনিষ্ঠ কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে চায়। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা , ক্লাবেরই কোনো কর্তার বেনামে করা স্বশাসিত কোম্পানিকে ২৫ শতাংশ শেয়ার দিয়ে ঘুরপথে , বকলমে, পরোক্ষে কার্যত নিজের হাতেই ৫০শতাংশ শেয়ার রাখতে চায় তারা। সিংহভাগ শেয়ার তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেলে দল গঠন থেকে শুরু করে কোনো কিছুতেই যে তাঁদের গুরুত্ব থাকবে না সেটা কর্তারা বেশ বুঝতে পারছেন। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানকে চোখের সামনে দেখেই তাঁরা এই শিক্ষাটা নিয়েছেন। আইলিগ আর আইএসএল যে এক নয় সেটা তাঁরা বুঝে গেছেন। তৈরি না

হয়ে আইএসএল খেলে ইস্টবেঙ্গলের মতো শহীদ হিসাবে উদাহরণ রেখে যেতে তাঁরা যে মোটেই চান না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এবারের আইলিগে করোনার জন্য মহামেডান ক্লাব হয়ত একটু সুবিধা পেয়েছে। বিশেষত সেন্ট্রালাইজড ভেনু হওয়ার জন্য পুরো টুর্নামেন্টটাই কলকাতায় হয়েছে। কিন্তু তাবলে মহামেডানকে খাটো করা কিন্তু যাবে না। রিয়াল কাশ্মীর, চার্চিল ব্রাদার্স, শ্রীনিধি এফসি, রাউন্ডগ্লাস পাঞ্জাব এবং সর্বোপরি গোকুলম কেরালা এফসিআই লিগের দল হিসেবে যথেষ্ট শক্তিশালী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রাক্তন খেলোয়াড়ের মত , যদি আইলিগে আইএসএলের মতো বিনিয়োগ হত তাহলে এই দুই লিগের সেঅর্থে বিরাট কোনো পার্থক্য থাকবে না। এখনই গোকুলমের কাছে নিজের মাঠে হেরেছে মোহনবাগান , মহামেডান। তাহলে সঠিক বিনিয়োগ হলে কী হত। এইসব দলকে হারিয়ে মহামেডানের আইলিগ রানার্স হওয়া কিছু মুখের কথা নয়। আগামী দিনের মহামেডান আরও শক্তিশালী হোক, আইএসএল খেলুক এই কামনাই করি।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন